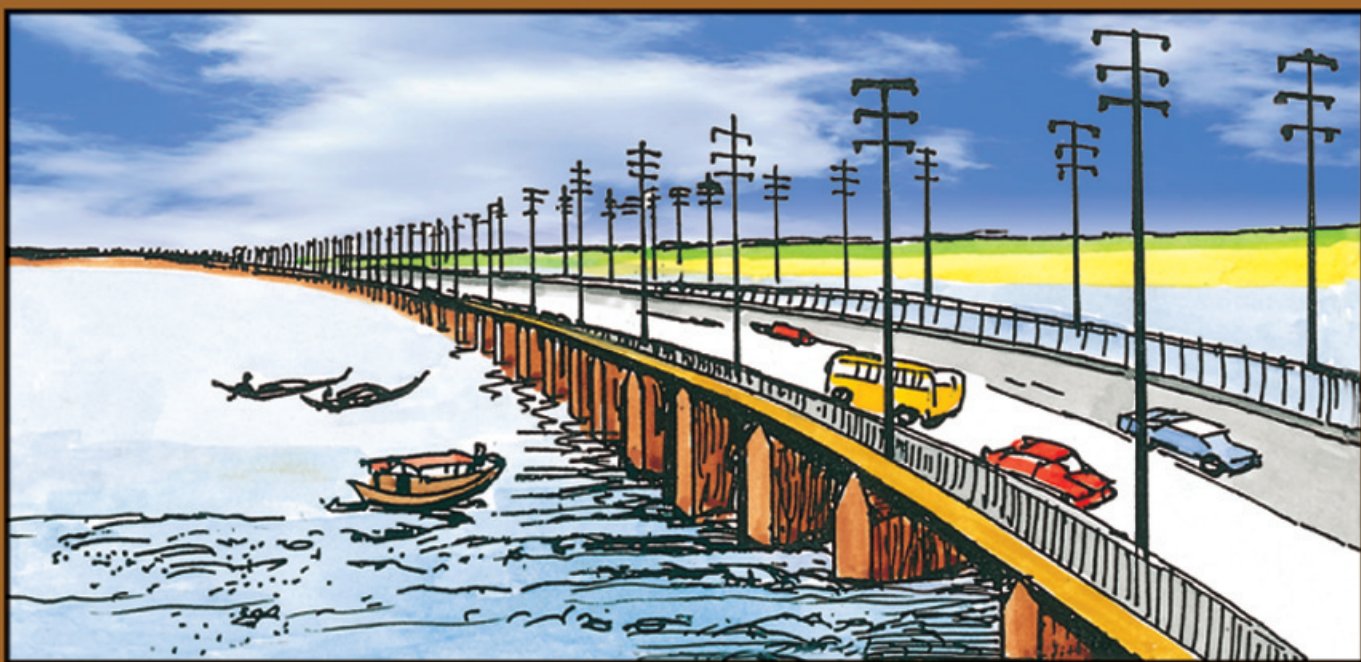
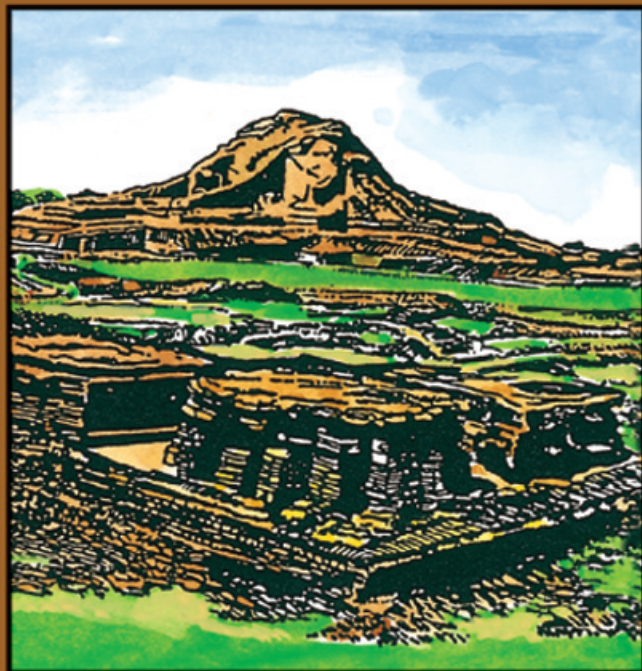


পরিবেশ পরিচিতি সমাজ

চতুর্থ শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ

চতুর্থ শ্রেণী

রচনায়

প্রফেসর কাজী মদিনা

আব্দুল মালেক

মো: সুজা-উদ-দৌলা

মেহের মরিয়ম

সম্পাদনা

প্রফেসর মো: আলতাফ হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সবস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৪
পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৯

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন
বীরেন সোম

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিঃ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়।

পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক ‘পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ’ রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর প্রফেশনাল কমিটি, এনসিসিসি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পুস্তকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু শিশুর পরিচিত সামাজিক পরিবেশের উপাদান থেকে চয়ন করা হয়েছে, যাতে শিশু তার সামাজিক পরিবেশকে জানার, পরিবেশের ব্যবহার ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে।

বইটির বিষয়বস্তু শিশুদের বোধগম্য সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে এবং শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া মূল্যায়নের জন্য অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত নৈব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্ন রয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোন গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সজ্জী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধেও প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত হল তারা উপকৃত হবে এবং আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় এক	পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ	১-৫
অধ্যায় দুই	আমরা সবাই মানুষ	৬-১২
অধ্যায় তিন	সামাজিক গুণাবলি	১৩-১৮
অধ্যায় চার	আমাদের মৌলিক অধিকার	১৯-২৪
অধ্যায় পাঁচ	বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ	২৫-৩২
অধ্যায় ছয়	বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ	৩৩-৩৯
অধ্যায় সাত	বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব	৪০-৪৬
অধ্যায় আট	আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য	৪৭-৫৬
অধ্যায় নয়	আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি	৫৭-৬৫
অধ্যায় দশ	স্বাধীনতার মহানায়ক	৬৬-৭০
অধ্যায় এগার	স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক	৭১-৮২
অধ্যায় বার	আদিবাসীদের জীবনধারা	৮৩-৯৩
অধ্যায় তের	শ্রমের মর্যাদা	৯৪-৯৯
অধ্যায় চৌদ্দ	নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য	১০০-১০৫
অধ্যায় পনের	গণতান্ত্রিক মনোভাব	১০৬-১১২
অধ্যায় ষোল	আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ	১১৩-১১৯
অধ্যায় সতের	এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতি	১২০-১২৯
অধ্যায় আঠার	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	১৩০-১৩৫

অধ্যায় এক

পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ

মা বাবা ভাই বোন নিয়ে আমাদের পরিবার। পরিবারে আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু কাজ রয়েছে। যেমন, বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গায় ফুল ও ফলের গাছ লাগানো এবং গাছের যত্ন নেওয়া, গৃহপালিত পশুপাখির যত্ন করা ইত্যাদি। এগুলো পরিবারের উন্নয়নমূলক কাজ। পরিবারের মত বিদ্যালয়েরও কিছু উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে। এসব কাজে আমরা অংশগ্রহণ করব।

আমরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করি। বিদ্যালয়ে অনেক আসবাবপত্র রয়েছে, যেমন, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি, ব্ল্যাক বোর্ড, ফ্যান ইত্যাদি। আমরাই এগুলো ব্যবহার করি। আমরা যত্ন সহকারে এগুলো ব্যবহার করব। এগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখব। চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চে পেনসিল, কলম বা কোন কিছু দিয়ে লিখব না, দাগ দেব না। শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরের দেয়ালে কিছু লিখব না। বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব। নিচের ছকটি খাতায় তুলে বিদ্যালয়ে আমরা কী কী কাজ করব তা লিখি।

বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ
১.
২.
৩.
৪.

বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে আমরা অংশগ্রহণ করব, যেমন, বিদ্যালয়ের আশেপাশের খালি জায়গায় ফুল ও শাকসব্জির বাগান করব। আমরা বিদ্যালয়ের মাঠের চার দিকে



চিত্র ১.১ : বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শাকসব্জির বাগান ও বৃক্ষরোপণ

ফুল, ফল এবং মূল্যবান গাছ
লাগাব। এগুলো
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
প্রয়োজনমত বেড়া দেব।
গাছের গোড়ায় পরিমাণমত
পানি ও সার দেব। বিদ্যালয়
প্রাঙ্গণ কখনই অপরিষ্কার
করব না।

বিদ্যালয়ে আমরা পাঠাগার
গড়ে তুলব। সাধ্যমত আমরা

পাঠাগারে বই দেব। পাঠাগারের জন্য বই সংগ্রহ করব। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে
পাঠাগারে নিয়মিত বই পড়ব। এভাবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও জ্ঞান বাড়বে।
আমরা আলোকিত হব। আমরা পাঠাগারের বই পড়ব এবং বই যথাস্থানে গুছিয়ে
রাখব। কখনই বই ছিঁড়ব না।

দাগ দেব না। ভাঁজ করব না।
পাঠাগারে অযথা কথা বলব
না। নীরবতা পালন করব।

এভাবে আমরা নিজ বাড়ি,
পাড়া বা মহল্লায়ও পাঠাগার
গড়ে তুলব। পাঠাগারের যত্ন
করব।



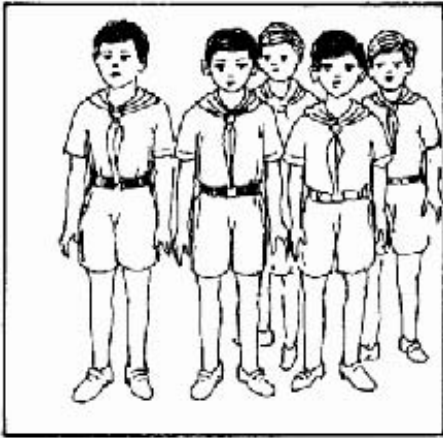
চিত্র ১.২ পাঠাগারে ছাত্রছাত্রীরা বই পড়ছে

বিদ্যালয়ে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করব নিচের ছকটি খাতায় তুলে তা লিখি।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ	
১।	
২।	
৩।	
৪।	
৫।	
৬।	

বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে আমরা বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করব। এর মধ্যে স্কাউটিং এবং গার্ল গাইডিং উল্লেখযোগ্য।

স্কাউটিং-এর প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে কাবিং। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলে শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে কাব দল গঠিত হয়। কাব সদস্যরা সর্বোচ্চ ৩ মাস হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে সদস্য ব্যাজ অর্জন করতে পারে। আরও ৬ থেকে ৯ মাস প্রশিক্ষণের পর তারা পোশাক, সদস্য ব্যাজ ও স্কার্ফ লাভ করে। ২৪ জন কাব নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বা একাধিক কাব দল খোলা যেতে পারে। প্রতি সপ্তাহে কাবদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে কাবেরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা,



চিত্র : ১.৩ কাব দল



চিত্র : ১.৩ কাব দল

পোশাকের যত্ন, বৃক্ষরোপণ, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং মজার মজার খেলাধুলাসহ নানা ধরনের সেবামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

৬ থেকে ১০ বছর বয়সের মেয়ে শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে ‘হলদে পাখির দল’ গঠিত হয়। হলদে পাখির প্রশিক্ষণ সাধারণত খেলার মাধ্যমে দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ ২৪ জন নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। হলদে পাখির আদর্শ বাক্য হচ্ছে ‘সাহায্য করা’।

‘কাব’ এবং ‘হলদে পাখির দল’ বিদ্যালয়ে ও সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। আমরাও আমাদের বিদ্যালয়ে ‘কাব’ এবং ‘হলদে পাখির দল’ গঠন করব।

আমরা আমাদের পরিবার ও বিদ্যালয়ে সব রকম উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করব। এভাবে সমাজ ও দেশের উন্নতি হবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. আমরা বিদ্যালয়ে -করি।
- খ. স্কুল ভবন বা দেয়ালে কিছু-না।
- গ. বিদ্যালয়ে আমরা-গড়ে তুলব।
- ঘ. আমরা পাঠাগারের বই পড়ব এবং বই- গুছিয়ে রাখব।
- ঙ. ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের মেয়ে শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে- দল গঠিত হয়।

২। নিচের শূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. বিদ্যালয়ে আমরা পাঠাগার গড়ে তুলব।
- খ. আমরা পাঠাগারের বই কখনই ছিঁড়ব না।
- গ. ২৬ জন কাব নিয়ে একটি দল গঠিত হয়।
- ঘ. হলদে পাখির আদর্শ হচ্ছে সাহায্য করা।
- ঙ. ১০-১৫ বছর বয়সের ছেলে শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে কাব দল গঠিত হয়।

অধ্যায় দুই

আমরা সবাই মানুষ

আমাদের পরিবারে দাদা-দাদী, বাবা-মা, চাচা-চাচী, মামা-মামী, ফুপু-ফুপা, খালা-খালু আছেন। ভাই ও বোন আছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী আছে। শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন। এদের মধ্যে দাদা, বাবা, চাচা, মামা, ফুপা, খালু, ভাই, ছাত্র, শিক্ষক- এরা হলেন পুরুষ। আর দাদী, মা, চাচী, মামী, ফুপু, খালা, বোন, ছাত্রী, শিক্ষিকা- এরা হলেন নারী। নারী পুরুষ একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করে সমাজে বসবাস করেন। আমরা এক জনের সাহায্য ছাড়া অন্য জন চলতে পারি না।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে কে নারী কে পুরুষ লিখি।

	নারী	পুরুষ		নারী	পুরুষ
ফুপু			মা		
বাবা			শিক্ষিকা		
শিক্ষক			বোন		
বালক			মামা		
দাদা			ফুপা		

সমাজে নারী পুরুষের সমান দায়িত্ব রয়েছে। বাবা কাজ করেন। মা কাজ করেন। ভাই পড়াশুনা করে। বোন পড়াশুনা করে। শিক্ষক পাঠদান করেন। শিক্ষিকা পাঠদান করেন। নারী ও পুরুষের যেমন দায়িত্ব রয়েছে ঠিক তেমনি একই রকম সুযোগ ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

আমাদের সমাজে পুরুষদের যেমন সুযোগ আছে নারীদের তেমন নেই। অনেকে মনে করে বালিকা পুতুল খেলবে। বালক বল খেলবে। ভাই নিজের কাজ নিজে করবে না। ভাইয়ের কাজ বোন করে দিবে। মা ঘর সংসারের কাজ একা করবেন। বাবা শুধু চাকরি করবেন। এটা ঠিক নয়। সমাজে নারী পুরুষ সবার প্রতি সবার সহানুভূতি ও সহযোগিতা থাকতে হবে। সমাজে নারী পুরুষের কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নারী পুরুষের কাজ এক ও

অভিন্ন। সুতরাং পুরুষ ও নারীর সুযোগ সুবিধা ভোগ করবার সমান অধিকার রয়েছে। নারীরা পুরুষের মত সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারলে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে।



চিত্র ২.১ : পুরুষ ও নারী অফিসে কাজ করছেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আগে সমাজে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা ছিল না। ১৮৫৭ সালের ৮ ই মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি সূঁচ কারখানায় নারী শ্রমিকরা তাদের মজুরির অসমতা এবং দৈনিক বার ঘণ্টা কাজ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। সেখানে জার্মানীর নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেন। নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীরা সমাজে কতখানি বঞ্চনার শিকার সেসব মূল্যায়ন করা হয় এই দিনটিতে। নারীদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কী করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই হল এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে জাতিসংঘ ৮ই মার্চ তারিখকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব কী নিচের ছকে পড়ি।

সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে।
নারী ও পুরুষের কাজের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।
নারীরা নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সর্বদা সচেতন থাকবে।

নারী ও পুরুষের কাজের সমতা

নারী বাড়িতে কাজ করেন। ক্ষেতে কাজ করেন। অফিসে কাজ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। পুরুষও ক্ষেতে কাজ করেন। কারখানায় কাজ করেন। অফিসে কাজ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তাই সমাজে নারী ও পুরুষের কাজ এক। বাড়ির কাজ নারী ও পুরুষ মিলেমিশে করলে পরিবারে শান্তি আসবে। নারী একা বাড়ির কাজ করলে বাইরের কাজ করার সময় পাবেন না। সব কাজ নারী পুরুষ এক সাথে করলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা আসবে। সমাজের উন্নয়ন দ্রুততর হবে।

বিদ্যালয়ে আমরা ছাত্রছাত্রী একই শিক্ষাক্রম অনুসরণ করি। ঠিক একইভাবে বিদ্যালয়ের যে কোন কাজ ছেলে মেয়ে এক সাথে মিলেমিশে করব। বাড়িতে ভাই বোন নিজ নিজ কাজ করব। ছেলে মেয়ে আলাদা না ভেবে আমরা সবাই সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করে কাজ করব। ছেলে মেয়ের মধ্যে সব কাজে সমতা আসলে মেয়েদের মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে।

মানুষ সমাজবান্দ জীব। আমরা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবেসে সমাজে বাস করি। ছেলে মেয়ে আমরা আমাদের পাড়ার বড়দের শ্রদ্ধা করব। ছোটদের আদর করব। আমার পাশের বাড়ির কারও কোন অসুবিধা হলে আমি সাহায্য করব। সবার প্রতি সমান সৌজন্য দেখাব। তাহলে সমাজের সদস্যদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

আমরা সবাই মানুষ। সমাজে আমরা এক সাথে বাস করি। সমাজে অনেকে ধনী। অনেকে গরীব। অনেকে মুসলমান। অনেকে হিন্দু। অনেকে বৌদ্ধ আবার অনেকে খ্রিস্টান।

সমাজে একেক জন একেক রকম পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। আমরা সবার পেশার প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাব। সবাই একসাথে মিলেমিশে সমাজে বসবাস করব।

ব্যতিক্রমী শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতি আচরণ

সমাজে অনেক শিশু নানা রকম শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুরা অনেক কিছু বুঝতে পারে না। অনেক ধরনের কাজ করতে পারে না। আমরা যারা সুস্থ তারা এ রকম শিশুদের সব সময় সাহায্য করব। বাড়িতে, বিদ্যালয়ে অথবা আমাদের আশেপাশে এমন শিশু থাকলে তাদেরকে এক সাথে নিয়ে খেলব। বিদ্যালয়ে যেতে সাহায্য করব। ওদের মনে কোন রকম কষ্ট দিব না। সব সময় ওদেরকে আনন্দে রাখতে চেষ্টা করব।



চিত্র : ২.২ ব্যতিক্রমী শিশু হাঁটছে

আমাদের আশেপাশে অনাথ অথবা অভাবগ্রস্ত শিশু রয়েছে। আমরা আমাদের আহার থেকে ওদেরকে আহার দিব। নিজের পোশাক থেকে ওদেরকে পোশাক দিব। ওদেরকে সব সময় বোঝাতে চেষ্টা করব আমরা সবাই মানুষ। আমরা সবাই তোমাদের পাশে আছি।

এই শিশুরা আমাদেরই মত শিশু। আমরা কখনও কোনভাবে তাদের মনে দুঃখ কষ্ট দিব না। তাদেরকে বুঝতেই দিব না যে তারা অসহায়। তাদের কোন রকম অসুবিধা হলে এমনভাবে সাহায্য করব যেন তারা মনে করে তারা আমাদের মত সুস্থ ও স্বাভাবিক। তাদের কাজটি আমরা আগে করব। তারপর নিজ কাজ করব।

আমাদের বাড়ি ও আশেপাশে কোন ব্যতিক্রমী ব্যক্তি থাকলে তাঁদের কাছে নিয়মিত যাব।

তাদেরকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাও। তাঁদের কোন কাজ থাকলে করে দেব। তাঁদের প্রতিটি প্রয়োজনকে গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দেব। ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের সহমর্মিতা দেখাব ও সর্বদা শ্রদ্ধা করব।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের প্রতি কী করব তা লিখি।

১।
২।
৩।
৪।

সমাজে পুরুষ নারী আমরা সবাই মানুষ। সমাজে নারী পুরুষের সমান গুরুত্ব রয়েছে। নারী ও পুরুষের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সমান অধিকার রয়েছে। আমরা সমাজের সবার প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাব। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করব। সবার সাথে মিলেমিশে চলব। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াব। তাঁদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিব।

অনুশীলনী

১. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- (ক) আমরা এক জনের সাহায্য ছাড়া ——— চলতে পারি না।
- (খ) সমাজে নারী পুরুষের ——— দায়িত্ব রয়েছে।
- (গ) অভাবগ্রস্ত শিশুদের বোঝাতে চেষ্টা করব আমরা সবাই ———।
- (ঘ) নারী পুরুষের কাজ ———।
- (ঙ) নারীরা নিজ ——— প্রতিষ্ঠা করতে সর্বদা সচেতন থাকবে।

২। নিচের শূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- (ক) নারী পুরুষ একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করে সমাজে বসবাস করেন।
- (খ) নারীরা পুরুষের মত সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারলে সামাজিক মর্যাদা বাড়বে।

- গ. বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী ভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে।
 ঘ. নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে ভেদাভেদ রয়েছে।
 ঙ. আমরা সবার পেশার প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাব।

৩. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. সমাজে নারী পুরুষের	জন্মগ্রহণ করে
খ. সমাজে অনেক শিশু নানা রকম শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা নিয়ে	কাজ এক
গ. সমাজে নারী ও পুরুষের	সবাই মানুষ
ঘ. সমাজে পুরুষ নারী আমরা	সহমর্মিতা দেখাব
ঙ. ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের	সমান গুরুত্ব রয়েছে

৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ সমাজে একে অন্যকে সাহায্য করে কারা বসবাস করেন?

- ক. নারী পুরুষ খ. দাদা দাদী
 গ. বালক বালিকা ঘ. ছাত্র ছাত্রী।

৪.২ নারী পুরুষের মত সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারলে কী হবে?

- ক. নারীরা সুখী হবে খ. নারীদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে
 গ. নারীরা বেশি কাজ করবে ঘ. নারীরা সচেতন হবে।

৪.৩ জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে কোন দিনটিকে স্বীকৃতি দেয়?

- ক. ১০ ই মার্চ খ. ৯ ই মার্চ
 গ. ৮ ই মার্চ ঘ. ৭ ই মার্চ।

৪.৪ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের কথা কে ঘোষণা করেন?

- ক. ক্লারা জেটকিন খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
 গ. হেলেন কেলার ঘ. শামসুন নাহার মাহমুদ।

৪.৫ ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

- | | |
|------------------|------------------|
| (ক) ঢাকা | (খ) দিল্লী |
| (গ) লুক্সেমবার্গ | (ঘ) কোপেন হেগেন। |

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- (ক) সমাজে পুরুষ ও নারী কারা ?
- (খ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের উদ্দেশ্য কী ?
- (গ) আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব লেখ।
- (ঘ) ব্যতিক্রমী শিশুদের কীভাবে সাহায্য করবে?
- (ঙ) অনাথ অথবা অসহায় শিশুদের সাথে কী আচরণ করবে?
- (চ) সমাজে নারী পুরুষের সমান গুরুত্ব রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায় তিন

সামাজিক গুণাবলি

আমরা পরিবারে বাস করি। পরিবারের বাইরে রয়েছে পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন। বিদ্যালয়ে রয়েছে সহপাঠী, শিক্ষক এবং আরো অনেকে। সকলকে নিয়েই আমাদের সমাজ। মানুষ সামাজিক জীব। আদিকাল থেকে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করছে। প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন সমাজে বাস করে। সমাজের ভিত্তি হল ঐক্য, সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা। সমাজে কিছু কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। আমরা সমাজের নিয়মগুলো মানব। ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করব।

আমরা কী কী সামাজিক গুণ অর্জন করব নিচের ছকটি খাতায় তুলে তা লিখি।

সামাজিক গুণাবলি
১।
২।
৩।
৪।
৫।

পরিবার

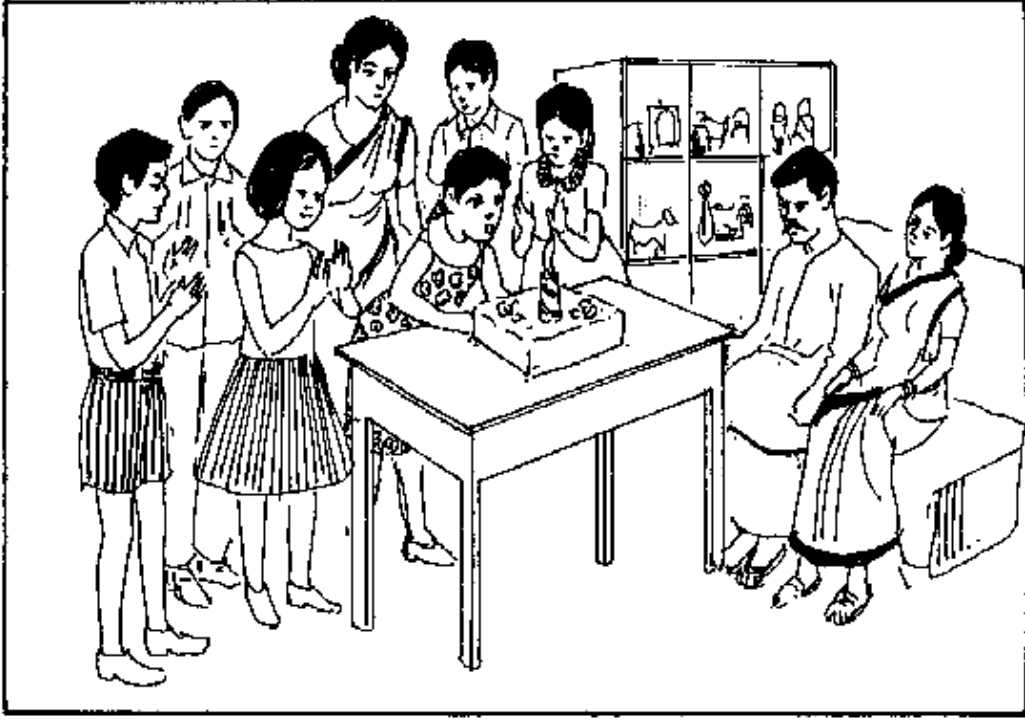
মা বাবা ভাই বোন নিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের পরিবার। মা বাবা ছাড়াও অনেক পরিবারে দাদা-দাদী, চাচা, ফুপু অথবা নানা-নানী, মামা, খালা থাকেন। তাদের স্নেহ আদরে গড়ে ওঠে আমাদের জীবন। পরিবারে বড়দের শ্রদ্ধা করব, ছোটদের স্নেহ করব। ছোট বড় সকলের সাথে মিলেমিশে থাকব। তাদের নানা কাজে সাহায্য সহযোগিতা করব। আমরা গোসল, খাওয়া, লেখাপড়া, খেলাধুলা সবকিছুই সময়মত করব। আমাদের মনে রাখতে

হবে “পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা”। বাড়ির কারও সাথে কখনই খারাপ ব্যবহার বা অন্যায় আচরণ করব না। পরিবারে সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করব নিচের ছকটি খাতায় তুলে তা লিখি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

প্রতিবেশী

আমাদের বাড়ির আশেপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীরা আমাদের আপনজন। সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে প্রতিবেশীরা আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তাই আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিবেশীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ আমাদের চেয়ে বয়সে বড় কেউ বা ছোট। কেউ আবার সমবয়সী। আমাদের চেয়ে যাঁরা বড় তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব। ছোটদের ভালবাসব। সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে থাকব। প্রতিবেশীদের মনে কখনও কষ্ট দেব না। তাদের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব। তাদের বাড়ির বিয়ে, জন্মদিন বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে তারা দাওয়াত করলে যাব। তাদেরকেও আমাদের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেব। বাড়িতে ভাল কিছু রান্না হলে প্রতিবেশীদের বাড়িতে দেব। প্রতিবেশীদের কেউ দুর্ঘটনায় পড়লে, অসুস্থ হলে অথবা কেউ মারা গেলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাব। আমরা হৈ চৈ করব না। উচ্চ শব্দে রেডিও, টিভি অথবা ক্যাসেট প্লেয়ার বাজাব না, যাতে প্রতিবেশী ছাত্র বা অসুস্থ ব্যক্তির অসুবিধা হয়। এভাবে আমরা মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা গড়ে তুলব।



চিত্র ৩.১ : প্রতিবেশীর জন্মদিনে অংশগ্রহণ

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কী করণীয় নিচের ছকটি খাতায় তুলে তা লিখি।

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের করণীয়
১।
২।
৩।
৪।

বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করি। সমাজের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিখি। সেই সাথে পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জানতে পারি। অতিথি সেবা, দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার কথাও আমরা জানতে পারি।

লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমরা নানা রকম খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। বিদ্যালয় থেকে আমরা বনভোজন অথবা শিক্ষা সফরে ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাই। এসব কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন বিষয়ে জানতে পারি। ফলে আমাদের মাঝে সহযোগিতা, সহানুভূতি, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচার ইত্যাদি সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে। সমাজের বিভিন্ন কর্তব্য পালনে এসব সামাজিক গুণের প্রয়োজন হয়।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

বিদ্যালয়ে আমরা যেসব কাজে অংশগ্রহণ করি	এসব কাজের মাধ্যমে আমাদের যে সকল সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।

বিদ্যালয়ে সময়মত এবং নিয়মিত যাওয়া ও মন দিয়ে লেখাপড়া করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। সহপাঠীদের সাথে ভাল ব্যবহার করব। বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমাদের আদর স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা দেন। তারা সবসময় আমাদের মজল কামনা করেন। তাঁদের সাথে কখনও অশোভন আচরণ করব না। তাঁদের আদেশ উপদেশ মেনে চলব। তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করব।

শিক্ষক ছাড়াও বিদ্যালয়ে দারোয়ান, পিয়ন, বাডুদার এবং আরো অনেক কর্মচারি থাকেন। তাঁদের সাথেও ভাল ব্যবহার করব। তাঁদের বিপদে আপদে সাহায্য সহযোগিতা করব।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল। সবার সাথেই আমরা ভাল ব্যবহার করব।

মানুষের জীবনে সময়ের মূল্য অপরিমিত। প্রতি দিনের কাজ প্রতিদিন করব। আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখব না। এভাবে কাজ করলে আমাদের সময়মত কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। আমাদের জীবনে সফলতা আসবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. আদিকাল থেকে মানুষ — হয়ে জীবনযাপন করছে।
 খ. আমাদের বাড়ির আশেপাশে যারা থাকেন তারা আমাদের —।
 গ. সমবয়সীদের সাথে — থাকব।
 ঘ. বিদ্যালয়ে আমরা — করি।
 ঙ. আমরা সবার সাথেই — ব্যবহার করব।

২। নিচের উক্তিগুলোর যেটি শুদ্ধ তার ডান পাশে ‘শু’ এবং যেটি অশুদ্ধ তার ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. মানুষ সামাজিক জীব।
 খ. পরিবারে বড়দের স্নেহ করব, ছোটদের শ্রদ্ধা করব।
 গ. আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিবেশীর ভূমিকা অত্যন্ত কম।
 ঘ. বিদ্যালয়ের শিক্ষকের আদেশ উপদেশ মেনে চলব।
 ঙ. মানুষের জীবনে সময়ের মূল্য অপরিসীম।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

- ক. মা বাবা ভাইবোন নিয়ে
 খ. বাড়ির আশেপাশে থাকেন
 গ. বিদ্যালয়ে আমরা
 ঘ. মানুষের জীবনে সময়ের মূল্য

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ আমাদের পরিবার গড়ে ওঠে –

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ক. শিক্ষকদের নিয়ে | খ. মা বাবা ভাই বোন নিয়ে |
| গ. বাড়ির আশেপাশের লোকদের নিয়ে | ঘ. বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে। |

৪.২ সমাজের ভিত্তি কোনটি?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. ঐক্য | খ. কর্তব্যবোধ |
| গ. শিষ্ঠাচার | ঘ. ন্যায়বোধ। |

৪.৩ আমাদের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. শিক্ষক | খ. প্রতিবেশী |
| গ. দাদা দাদী | ঘ. সহপাঠী। |

৪.৪ বিদ্যালয়ে আমাদের প্রধান দায়িত্ব কী?

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ক. মিলেমিশে থাকা | খ. বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ানো |
| গ. মন দিয়ে লেখাপড়া করা | ঘ. গাছ লাগানো। |

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক. আমরা কী কী সামাজিক গুণাবলি অর্জন করব?
- খ. পরিবারের প্রতি আমাদের করণীয় কী?
- গ. প্রতিবেশীদের জন্য আমরা কী কী করব?
- ঘ. শিক্ষকের সাথে আমরা কেমন ব্যবহার করব?
- ঙ. আমাদের জীবনে সফলতা কীভাবে আসবে?

অধ্যায় চার

আমাদের মৌলিক অধিকার

আমরা শিশু। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সমাজে আমাদের অনেক অধিকার রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীতে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে আমাদের কিছু অধিকার সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা সমাজের সকল মানুষের কতকগুলো অধিকার সম্পর্কে জানব।

পৃথিবীর সকল বয়সের, ধর্মের ও জাতির মানুষের জন্য কতকগুলো অধিকার রয়েছে। এসব অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার বলে। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক অধিকারসমূহ গৃহীত হয়। এটিকে “মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র” বলা হয়। এ ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন ধারায় পৃথিবীর সকল মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো তুলে ধরা হয়েছে। নিচের ছকে মানুষের প্রধান মৌলিক অধিকারগুলো পড়ি—

প্রধান প্রধান মৌলিক অধিকার
১. সব মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন।
২. প্রত্যেকের নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।
৩. কাউকে নির্যাতন করা যাবে না।
৪. আইনের চোখে সকলেই সমান।
৫. কাউকে খেয়াল খুশি মত গ্রেফতার ও আটক করা যাবে না।
৬. কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।
৭. প্রত্যেকেরই নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে।
৮. প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

এসব মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকব।

পরিবারে মৌলিক অধিকার

আমরা মা বাবার সাথে পরিবারে বাস করি। প্রত্যেক পরিবারে নানা বয়সের মানুষ বাস করেন। পরিবারে আমাদের চেয়ে বয়সে বড়রা রয়েছেন। যেমন, মা, বাবা, বড় ভাই ও

বোন। কোন কোন পরিবারে দাদা-দাদী, চাচা, ফুপু, নানা-নানী, মামা, খালাদের কেউ কেউ থাকেন। আবার পরিবারে আমাদের চেয়ে ছোটরাও থাকতে পারে। যেমন আমাদের ছোট ভাই ও বোন। পরিবারে বড়দের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি ছোটদেরও অধিকার রয়েছে।



চিত্র ৪.১ : পরিবারে নারী ও পুরুষ



চিত্র ৪.২ : পরিবারে বালক ও বালিকা

একটি পরিবারে পুরুষ সদস্য থাকেন, আবার নারী সদস্যও থাকেন। যেমন বাবা ও ভাই পুরুষ সদস্য। পরিবারে দাদা, চাচা, নানা, মামা পুরুষ সদস্য। এমনভাবে মা ও বোন নারী সদস্য। পরিবারের দাদী, চাচী, ফুপু, নানী, খালা, মামী নারী সদস্য। এখন নিচের ছকটি খাতায় তুলে নিজে পূরণ করি—

আমাদের পরিবারে		আমাদের পরিবারে	
আমাদের চেয়ে বড় যাঁরা রয়েছেন	আমাদের চেয়ে ছোট যাঁরা রয়েছেন	নারী সদস্য যাঁরা রয়েছেন	পুরুষ সদস্য যাঁরা রয়েছেন
১.	১.	১.	১.
২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.

জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী পরিবারে নারী পুরুষ ও সব বয়সের সদস্যের কতকগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে। এগুলো নিচের ছকে পড়ি।

পরিবারে সকলের মৌলিক অধিকার	
১. খাদ্যের অধিকার	সুস্বাস্থ্য গঠন ও রক্ষায় প্রত্যেকের প্রয়োজন মত খাদ্য লাভের অধিকার।
২. বস্ত্রের অধিকার	প্রয়োজনীয় বস্ত্র বা পোশাক লাভের অধিকার।
৩. বাসস্থানের অধিকার	উন্নত বাসস্থানে বসবাসের অধিকার।
৪. চিকিৎসার অধিকার	সব বয়সের সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা লাভের অধিকার।
৫. শিক্ষা লাভের অধিকার	উপযুক্ত বয়সে প্রত্যেক সদস্যের শিক্ষা লাভের অধিকার।
৬. নিরাপত্তা লাভের অধিকার	সব বয়সের সদস্যের নিরাপত্তা লাভের অধিকার।

এসব অধিকার বড়দের সাথে সাথে শিশুদের জন্যও প্রযোজ্য।

পরিবারে আমরা নিজেদের এবং অন্য সদস্যদের এসব অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকব। পরিবারে কারও অধিকারই যাতে খর্ব না হয় সেদিকে সবাই খেয়াল রাখব।

বাংলাদেশে শহর ও গ্রামে অনেক পরিবারে বিভিন্ন কাজে সহায়তার জন্য লোক থাকেন। এরা হলেন গৃহকর্মী। মানুষ হিসেবে এদেরও কতকগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে। এ অধিকারগুলো হচ্ছে-

১. প্রয়োজন মত খাবার পাওয়া,	২. ভাল পোশাক লাভ করা,
৩. স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে ঘুমানোর সুযোগ পাওয়া,	৪. রোগে সুচিকিৎসা লাভ,
৫. লেখাপড়া শেখার সুযোগ লাভ,	৬. প্রয়োজনমত বিশ্রাম লাভ এবং
৭. নিরাপত্তা লাভ।	

গৃহকর্মীদের সাথে সকলের ভাল ব্যবহার করা উচিত। তাদের ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা যাবে না। তাদের সকল অধিকার পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব।

সমাজে মৌলিক অধিকার

সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করেন। আমাদের দেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের লোক বসবাস করেন। প্রত্যেক ধর্মেরই নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠান রয়েছে। নিচের ছকে বিভিন্ন ধর্মের প্রধান উৎসব অনুষ্ঠানের নাম পড়ি।

বিভিন্ন ধর্মের উৎসব অনুষ্ঠান			
ইসলাম ধর্ম	হিন্দু ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম	খ্রিস্ট ধর্ম
১. ঈদ-উল-ফিতর	১. দুর্গাপূজা	১. বুদ্ধ পূর্ণিমা	১. বড় দিন
২. ঈদ-উল-আযহা	২. সরস্বতী পূজা	২. মাঘী পূর্ণিমা	২. স্টার সানডে
৩. ঈদ-এ-মিলাদুননবী	৩. লক্ষ্মীপূজা	৩. মধু পূর্ণিমা	
৪. শবেবরাত	৪. কালীপূজা	৪. কঠিন চীবর দান	

প্রত্যেকের কাছে নিজ ধর্মের উৎসব অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র। নিজ ধর্মের উৎসব ও অনুষ্ঠান আয়োজন ও পালন করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। আমরা সকলেই এ বিষয়ে সচেতন থাকব। অন্য ধর্মের মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হয় এমন কোন কাজ করব না।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করেন। নিচের ছকে বিভিন্ন পেশাজীবীর নাম পড়ি।

সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষ			
১. কৃষক	৬. ধোপা	১১. শ্রমিক	১৬. আইনজীবী
২. কামার	৭. নাপিত	১২. রিকসাচালক	১৭. চিকিৎসক
৩. কুমোর	৮. মুচি	১৩. ফেরিওয়ালা	১৮. প্রকৌশলী
৪. তাঁতী	৯. দর্জি	১৪. কুলি	১৯. বিচারক
৫. জেলে	১০. স্বর্ণকার	১৫. ব্যবসায়ী	২০. শিক্ষক ইত্যাদি

সব পেশার মানুষের কাজই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাউকে ছোট গণ্য করব না।

সকলকে সম্মানের চোখে দেখব। সকল পেশার মানুষের মৌলিক অধিকার রয়েছে।

আমাদের মৌলিক অধিকার আদায়ে আমরা সব সময় সচেতন থাকব। সমাজে কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ কখনও করব না।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সমাজে আমাদের অনেক — রয়েছে।
- খ. প্রত্যেক পরিবারে — বয়সের মানুষ বাস করেন।
- গ. গৃহকর্মীদের সাথে সকলের — ব্যবহার করা উচিত।
- ঘ. সমাজে — ধর্মের মানুষ বাস করেন।
- ঙ. সকল পেশার মানুষের — অধিকার রয়েছে।

২। নিচের উক্তিগুলোর যেটি শুদ্ধ তার ডান পাশে ‘শু’ এবং যেটি অশুদ্ধ তার ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. পৃথিবীর সকল বয়সের, ধর্মের ও জাতির মানুষের জন্য কতকগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে।
- খ. পরিবারে বড়দের যেমন অধিকার রয়েছে, ছোটদের তেমন অধিকার নেই।
- গ. গৃহকর্মীদের কতকগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে।
- ঘ. কোন কোন পেশার মানুষের কাজ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ নয়।
- ঙ. আমাদের মৌলিক অধিকার আদায়ে আমরা সব সময় সচেতন থাকব।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. পরিবারে পুরুষ সদস্য থাকেন	পরিবারে মৌলিক অধিকার
খ. সব পেশার মানুষের	অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র
গ. উপযুক্ত বয়সে প্রত্যেকের	আবার নারী সদস্য থাকেন
ঘ. প্রত্যেকের কাছে নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান	সমাজে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভের অধিকার
ঙ. সব পেশার মানুষের কাজ	রয়েছে মৌলিক অধিকার রয়েছে

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে “মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র” গৃহীত হয় কোন তারিখে?

- (ক) ১৯৪৭ সালের ১০ ই আগস্ট (খ) ১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর
(গ) ১৯৫০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি।

৪.২ সব মানুষই জন্মগতভাবে কেমন?

- (ক) স্বাধীন (খ) পরাধীন
(গ) সচেতন (ঘ) অধিকারহীন।

৪.৩ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান উৎসব পালন করা কোন ধরনের অধিকার?

- (ক) রাষ্ট্রীয় অধিকার (খ) পারিবারিক অধিকার
(গ) রাজনৈতিক অধিকার (ঘ) মৌলিক অধিকার।

৪.৪ সুস্বাস্থ্য গঠন ও রক্ষায় প্রত্যেকের প্রয়োজন মত কী লাভের অধিকার রয়েছে?

- (ক) বইপত্র (খ) খাদ্য
(গ) বিশ্রাম (ঘ) পোশাক।

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- (ক) মৌলিক মানবাধিকার কাকে বলে?
(খ) মানুষের পাঁচটি প্রধান মৌলিক অধিকার উল্লেখ কর।
(গ) গৃহকর্মীদের কী কী অধিকার পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব?
(ঘ) প্রত্যেক ধর্মের মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আমরা কী করব?
(ঙ) সব পেশার মানুষকে সম্মানের চোখে দেখব কেন?

অধ্যায় পাঁচ

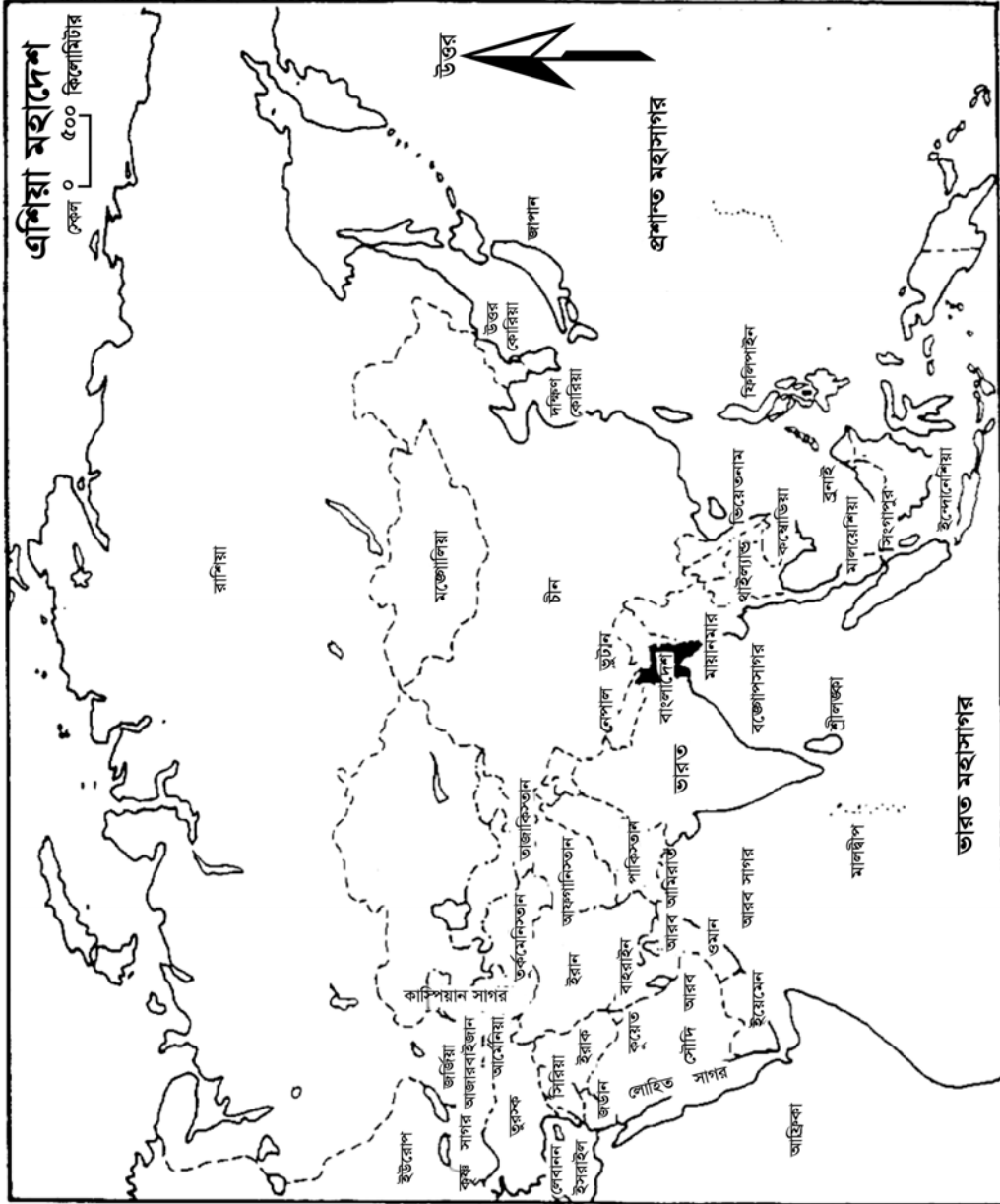
বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ

বাংলাদেশের অবস্থান

পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা এক নজরে সাগর, মহাসাগর ও মহাদেশগুলো দেখতে পাই। পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ আছে। মহাদেশগুলোর মধ্যে এশিয়া সবচেয়ে বড়। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত। আমরা মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের নিচে ডান দিকে তাকালে বাংলাদেশ দেখতে পাব। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম দিকে ভারত, পূর্বদিকে ভারত ও মায়ানমার এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।

এবার নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি :

পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা দেখি
বাংলাদেশ যে মহাদেশে অবস্থিত
বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের যে দিকে অবস্থিত
বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে
মায়ানমার বাংলাদেশের যে দিকে অবস্থিত



ভূমিরূপ

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই সমভূমি। দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কিছু অংশে পাহাড় রয়েছে।

ভূমির অবস্থা ও গঠন সময়ের হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিরূপকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. পাহাড়ী অঞ্চল

খ. পুরাতন পলি গঠিত উঁচু সমভূমি

গ. নবীন পলিগঠিত সমভূমি

পাহাড়ী অঞ্চল

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানই সমভূমি। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু পাহাড় রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ পাহাড় অবস্থিত। এসব পাহাড় টারশিয়ারী যুগে গঠিত হয়েছে। এ পাহাড়গুলো বেশ উঁচু। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম তাজিনডং। এই চূড়াটি ১২৩১ মিটার উঁচু। দেশের দ্বিতীয় উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম কেওক্লাডং। এর উচ্চতা ১২৩০ মিটার। দুইটি পাহাড়ই বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদী কর্ণফুলী, মাতামুহুরী ও সাংগু। এই পাহাড়ী এলাকায় বনভূমি আছে।

উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। এ পাহাড়গুলো বেশি উঁচু নয়। এসব পাহাড়কে ‘টিলা’ বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান এ সব পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত।

পুরাতন পলি গঠিত উঁচু সমভূমি

বাংলাদেশের কিছু এলাকা অনেক আগে গঠিত হয়েছে। এই এলাকাগুলো কিছুটা উঁচু। এসব উঁচু সমভূমি পুরাতন পলি দিয়ে গঠিত। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী

অঞ্চলের এই উঁচু সমভূমিগুলো বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলায় এ রকম উঁচু ভূমি আছে। গাজীপুর জেলার উঁচু ভূমিকে ভাওয়ালগড় এবং ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলার উঁচু ভূমিকে মধুপুরগড় বলে। এই অঞ্চলে শালবৃক্ষের বন আছে। কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে লালমাই নামে একটি ছোট ও নিচু পাহাড় আছে।

নবীন পলি গঠিত সমভূমি

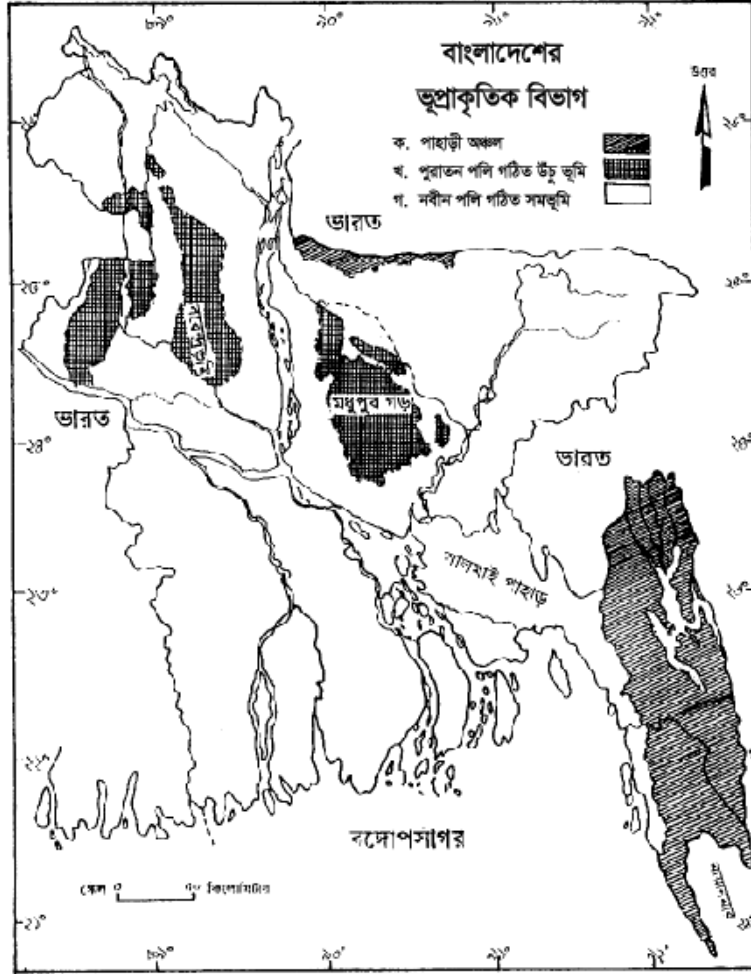
আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানই সমভূমি। এই সমভূমি ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু। সমভূমির ওপর দিয়ে অনেক নদী বয়ে চলেছে। নদীগুলো ঢাল অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। কোন কোন নদী অনেক বড়। এগুলোর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র অন্যতম। এদের অনেক উপনদী ও শাখা নদী আছে। বর্ষার সময় নদীগুলো কানায় কানায় ভরে যায়। অনেক সময় নদীর পানি দুই কূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। বন্যার ফলে নিচু ভূমিতে পলি জমে। নদীগুলো এভাবে পলিমাটি বহন করে এনে এক বিশাল সমভূমি গঠন করেছে। মাটিকে করেছে উর্বর। দেশের অধিকাংশ মানুষ এই সমভূমি এলাকায় বাস করে। সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিশাল সুন্দরবন অবস্থিত।

এবার নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

বাংলাদেশের ভূমিরূপকে ভাগ করা হয়-
বাংলাদেশের ভূমিরূপগুলো হচ্ছে-
বাংলাদেশের যে দিকে বেশি পাহাড় আছে-
আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত ভূমিরূপটির নাম-
আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বাস করে-

ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ

ক. পাহাড়ি অঞ্চল, খ. পুরাতন পলি গঠিত উঁচু ভূমি, গ. নবীন পলি গঠিত সমভূমি



জলবায়ু

বাংলাদেশ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। দেশের ওপর দিয়ে মৌসুমী বায়ু বয়ে যায়। এই বায়ুর প্রভাবে দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। খুব বেশি গরম পড়ে না। আবার খুব বেশি শীতও অনুভব করি না।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়। এ ঋতুগুলো হচ্ছে- গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু।

গ্রীষ্ম ঋতু

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ঋতু। এ সময়ে বেশ গরম পড়ে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 38° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। কোন কোন দিন তাপমাত্রা এর চেয়েও বেশি হয়। এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। এপ্রিল আমাদের দেশে উষ্ণতম মাস। এপ্রিল ও মে মাসে ঝড় বৃষ্টি হয়। এই ঝড় বৃষ্টিকে ‘কালবৈশাখী’ বলে। ঝড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়। বৃষ্টিপাত কৃষির উপকার করে।

বর্ষা ঋতু

গ্রীষ্মের পরেই বর্ষা ঋতু শুরু হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষা ঋতু। বর্ষা ঋতুতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। দেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ২০৩ সেন্টিমিটার। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প নিয়ে মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এই বায়ু দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলোতে বাধা পায় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। দেশের পূর্বাঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

শীত ঋতু

বর্ষা ঋতুর পর বাংলাদেশে তাপমাত্রা কমতে থাকে। ধীরে ধীরে শীত পড়ে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে শীত ঋতু স্থায়ী হয়। কোন কোন বছর বেশি শীত পড়ে। দেশের উত্তর অঞ্চলে বেশি শীত পড়ে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ মাসের গড় তাপমাত্রা প্রায় 18° সেলসিয়াস। জানুয়ারি বাংলাদেশের শীতলতম মাস।

আমরা নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

বাংলাদেশ যে জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত -
বাংলাদেশের জলবায়ুকে যে কয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয় -
আমাদের দেশে যে মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে -
বাংলাদেশের যে অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয় -
বাংলাদেশের শীতলতম মাস -

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা এক নজরে সাগর, মহাসাগর ও ---- দেখতে পাই।
 খ. এসব পাহাড়কে ----- যুগের পাহাড় বলে।
 গ. কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে ----- নামে একটি ছোট ও নিচু পাহাড় আছে।
 ঘ. কোন কোন ----- অনেক বড়।
 ঙ. বন্যার ফলে ----- ভূমিতে পলি জমে।

২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত।
 খ. আমাদের দেশের অধিকাংশ পাহাড় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
 গ. ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলার উঁচু ভূমিকে বরেন্দ্রভূমি বলে।
 ঘ. শীতকালে নদীর পানি উভয় কূল উপচে বন্যা হয়।
 ঙ. আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানই সমভূমি।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত
খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়গুলো	বঙ্গোপসাগর
গ. বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে	বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত
ঘ. গ্রীষ্মের পরেই শুরু হয়	মৌসুমী বায়ু
ঙ. বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়	বাংলাদেশ অবস্থিত
	বর্ষা ঋতু

৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ কোনটি পাহাড়ি এলাকার নদী?

ক. পদ্মা

খ. মেঘনা

গ. যমুনা

ঘ. কর্ণফুলী

৪.২ কুমিল্লা শহরের কোন দিকে লালমাই পাহাড় অবস্থিত?

ক. উত্তর দিকে

খ. দক্ষিণ দিকে

গ. পূর্ব দিকে

ঘ. পশ্চিম দিকে

৪.৩ আমাদের দেশে কোন মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে ?

ক. মার্চ

খ. এপ্রিল

গ. মে

ঘ. জুন

৪.৪ বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত কত সেন্টিমিটার ?

ক. ২০৩

খ. ২০০

গ. ১৫০

ঘ. ১২০

৪.৫ বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?

ক. নভেম্বর

খ. ডিসেম্বর

গ. জানুয়ারি

ঘ. ফেব্রুয়ারি

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা এক নজরে কী কী দেখি?

খ. বাংলাদেশের ভূমিরূপকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় এবং তা কী কী?

গ. বরেন্দ্রভূমি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত?

ঘ. বাংলাদেশের সমভূমি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

ঙ. বাংলাদেশের গ্রীষ্ম ঋতুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

অধ্যায় ছয়

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ

আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। বিভিন্ন কারণে পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষিত হলে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।

নিচের ছক খাতায় তুলে পরিবেশ দূষিত হলে কী হয় লিখি।

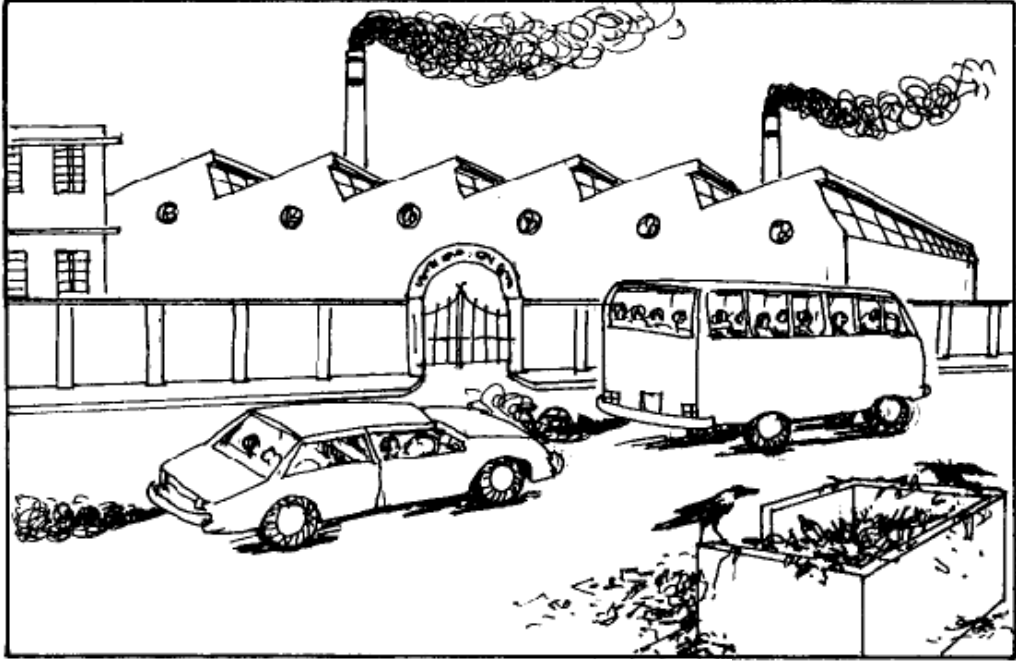
১।
২।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। মানুষ যত বাড়ছে পরিবেশগত সমস্যা ততই বাড়ছে। মানুষ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নতুন বসতি গড়ে উঠছে। বাসস্থান তৈরির জন্য গাছপালা কাটা হচ্ছে। জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। পানি দূষণ হচ্ছে। একই জমিতে বার বার ফসল ফলানোর জন্য ভূমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। মাটি দূষণ হচ্ছে। কলকারখানা, যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ হচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে আসছে। শহরে এসে বসতিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করছে। ফলে ক্রমাগত বাড়ছে পরিবেশ দূষণের মাত্রা। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পরিবেশে কী কী দূষণ হচ্ছে নিচের ছকে পড়ি।

১। বায়ু দূষণ
২। পানি দূষণ
৩। শব্দ দূষণ
৪। মাটি দূষণ

বায়ু দূষণ

আমরা বায়ু থেকে নিঃশ্বাস নিই। মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ যদি বায়ুর কারণে বিঘ্নিত হয় তখন তাকে বায়ু দূষণ বলে। গাড়ির কালো ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, মৃত জীবজন্তুর দুর্গন্ধ বায়ুকে দূষিত করে। বায়ু দূষণে কাশি, সর্দি এবং ফুসফুসে নানা রকম রোগ হয়।



চিত্র : ৬.১ বায়ু দূষণ

পানি দূষণ

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। জীবের ওপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টিকারী যে কোন উপাদান দ্বারা পানি যদি ব্যবহারের অনুপযোগী হয় তাকে পানি দূষণ বলে। পানিতে ময়লা, আবর্জনা, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, নর্দমার ময়লা, কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ইত্যাদি মিশলে পানি দূষিত হয়। দূষিত পানি পান করলে পেটের

পীড়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, জডিস ইত্যাদি রোগ হয়। অনেক সময় মাটির নিচের পানি আর্সেনিক যুক্ত হয়ে পানি দূষিত হয়। এই পানি ব্যবহার করলে চর্মরোগ হয়।



চিত্র ৬.২ : পুকুরের পানি দূষণ

শব্দ দূষণ

শব্দ এক প্রকার শক্তি যা কানে পৌঁছে শোনার অনুভূতি সৃষ্টি করে। উচ্চ তীব্র বা তীক্ষ্ণ যে সব শব্দ পরিবেশ এবং মানুষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে সে সব অবস্থাকে শব্দ দূষণ বলে। বাস, ট্রাক, জাহাজ, ট্রেনের হর্ণের উচ্চ শব্দ, বিমান ওড়বার শব্দ, মাইকের উচ্চ শব্দ সাধারণত শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে। তীব্র শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে বধির হয়ে যেতে পারে। রক্তচাপ বেড়ে হার্টের রোগ হতে পারে। তীক্ষ্ণ শব্দে মাথা ধরা, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগ হয় এবং মেজাজ খিটমিটে হয়।

নিচের ছক খাতায় তুলে শব্দ দূষণের কারণে কী কী রোগ হয় তা লিখি।

১।
২।
৩।

মাটি দূষণ

কৃষি কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, কারখানার বর্জ্য, মানুষ ও প্রাণীর মলমূত্র, শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা ইত্যাদি মাটি দূষণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি এবং বায়ু দূষণের মাধ্যমে মাটি দূষণ হয়। একই জমিতে বার বার শস্য উৎপাদন করলে ভূমির উর্বরতা কমে। দূষিত মাটিতে উৎপাদিত ফসল ও শাকসব্জি খেলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ

মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। মানুষ যত বাড়ছে সম্পদও তত বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক সময় মানুষ না বুঝে সম্পদের অপব্যবহার করে। আমরা আমাদের প্রয়োজনে অপয়োজনে আশেপাশের গাছপালা কেটে ফেলি। বনজ সম্পদ নষ্ট করি। ছোট ছোট পোনা মাছ ধরি। জীববৈচিত্র্য নষ্ট করি। মানুষের অপরিবর্তিত ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণ দ্রুততর হচ্ছে।

সামাজিক কারণ

পরিবেশ দূষণ বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। সামাজিক কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। যেমন-

- ১। আমরা অনেক সময় না বুঝে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে পরিবেশ দূষণ করি।
- ২। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে পরিবেশ দূষিত হয়।
- ৩। সচেতনতার অভাবে সামাজিক পরিবেশ দূষিত হয়।
- ৪। নিয়ম-নীতি মেনে না চললে সামাজিক পরিবেশ দূষিত হয়।

আমরা সব সময় চেষ্টা করব আমাদের বিদ্যালয় এবং আমরা যে এলাকায় বাস করি তা যেন দূষিত না হয়। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ, শ্রেণীকক্ষ, প্রাজাগ এবং পানি খাওয়ার স্থান সব সময় পরিষ্কার রাখব। নিজ এলাকায় যেখানে সেখানে ময়লা ফেলব না। বাড়িতে উচ্চ শব্দে রেডিও বাজাব না ও টেলিভিশন দেখব না। বিদ্যালয় ও এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করব।

পরিবেশের সাথে মানুষের জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। আমাদের জীবন সুস্থ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। আমরা সবাই এক সাথে সুন্দর, নির্মল ও স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট হব। তাহলেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

অনুশীলনী

১। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে তাই আমাদের - ।
- খ. আমাদের দেশে -দ্রুত বাড়ছে।
- গ. মানুষ যত বাড়ছে -তত বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ঘ. শব্দ এক প্রকার- ।
- ঙ. পরিবেশের সাথে মানুষের জীবন -জড়িত।

২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ।

- ক. পরিবেশ দূষিত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।
 খ. দূষিত পানি পান করলে ফুসফুসে নানা রকম রোগ হয়।
 গ. মানুষ যত বাড়ছে পরিবেশগত সমস্যা ততই বাড়ছে।
 ঘ. অনেক সময় মানুষ না বুঝে সম্পদের অপব্যবহার করে।
 ঙ. নিয়ম-নীতি মেনে চললে সামাজিক পরিবেশ দূষিত হয়।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. মানুষ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে	দূষিত হয়
খ. গাড়ির কালো ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, মৃত জীবজন্তুর দুর্গন্ধ	বায়ুকে দূষিত করে নতুন বসতি গড়ে উঠছে
গ. মাটির নিচের পানি আর্সেনিকযুক্ত হয়ে	পানি দূষিত হয়
ঘ. তীব্র শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে	বধির হয়ে যেতে পারে
ঙ. সচেতনতার অভাবে সামাজিক পরিবেশ	মাথা ধরা, অনিন্দ্রা রোগ হয়

৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে বলে-

- ক. পরিবেশ দূষণ খ. মাটি দূষণ
 গ. বায়ু দূষণ ঘ. শব্দ দূষণ।

৪.২ একই জমিতে বার বার ফসল ফলানোর জন্য জমির উর্বরতা-

- ক. একই রকম থাকে খ. অধিক বেড়ে যায়
 গ. কমে যায় ঘ. বেড়ে যায়।

৪.৩ পেটের পীড়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, জডিস ইত্যাদি রোগ কী কারণে হয়?

- ক. দূষিত পানি পান করলে খ. দূষিত বায়ু সেবন করলে
 গ. দূষিত পরিবেশে বাস করলে ঘ. দূষিত মাটিতে চলাচল করলে।

৪.৪ দূষিত মাটিতে উৎপাদিত ফসল ও শাকসব্জি খেলে-

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ক. কাশি সর্দি হয় | খ. ফুসফুসে রোগ হয় |
| গ. মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় | ঘ. জন্ডিস হয়। |

৪.৫ শব্দ দূষণ হয়-

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ক. মাইকের উচ্চ শব্দে | খ. মৃত জীবজন্তুর দুর্গন্ধে |
| গ. ময়লা আর্বজনা ফেললে | ঘ. গাড়ির কালো ধোঁয়ায়। |

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক. পরিবেশ দূষণ কাকে বলে?
- খ. পরিবেশ দূষিত হলে কী হয়?
- গ. বায়ু দূষণ কাকে বলে?
- ঘ. শব্দ দূষণের ফলে কী কী রোগ হয়?
- ঙ. মাটি কীভাবে দূষিত হয়?
- চ. কী কী সামাজিক কারণে পরিবেশ দূষিত হয়?
- ছ. বিদ্যালয় ও এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণে আমরা কী করব?

অধ্যায় সাত

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

আমাদের দেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শত সত্তর (১,৪৭,৫৭০) বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের আয়তন খুবই কম। এই ছোট দেশটিতে অনেক বেশি মানুষ বাস করে। ২০০১ সালের আদমশুমারির হিসেব অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ। আমাদের কাছের দেশ নেপালের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত একাশি (১,৪৭,১৮১) বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে এ দেশ দুটি প্রায় সমান। কিন্তু নেপালের জনসংখ্যা ২ কোটির কিছু বেশি।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আমাদের দেশের মত এত কম জায়গায় এত অধিক মানুষ বাস করে না। নিচের সারণীতে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা দেখি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা : ১৯৬১ – ২০০১

বছর	মোট জনসংখ্যা
১৯৬১	৫ কোটি ৫২ লক্ষ
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২০০১	১৩ কোটি

উৎস : Population Census 2001, Bangladesh Bureau of Statistics

আমরা দেখতে পাচ্ছি, গত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে প্রায় সাত কোটি মানুষ বেড়েছে। অথচ দেশের আয়তন আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত জন লোক বাস করে তাকে বোঝায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে ১৯৮১

সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৬০৯ জন। ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫৫ জনে। ২০০১ সালে আরও বেড়ে ৮৮১ জন হয়। আমরা জানি, চীন দেশে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সে দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১২৬ জন। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

জনসংখ্যা সমস্যা

বাংলাদেশে প্রতি দিনই মানুষ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এসব সমস্যার মূলে রয়েছে দেশের অধিক জনসংখ্যা।

আমাদের মৌলিক চাহিদার ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব

মানুষের কতকগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে এসব মৌলিক চাহিদার ওপর নানা রকম বিরূপ প্রভাব পড়ে। নিচের ছকে এ সম্পর্কে আমরা জানব:

মৌলিক চাহিদা	প্রভাব
১. খাদ্য	পরিবারে লোকসংখ্যা বাড়লে বেশি খাবারের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মা বাবা আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার জোগাড় করতে পারেন না। ফলে আমরা পুষ্টিহীনতায় ভুগি এবং বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হই।
২. বস্ত্র	অনেক মা বাবা ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারেন না। ছেঁড়া জামা-কাপড় পরতে হয়। পরিবারের লোকসংখ্যা কম হলে এ রকম অবস্থা হয় না।
৩. বাসস্থান	দেশের অধিকাংশ পরিবারে অভাব অনটন লেগে থাকে। এ জন্য অনেকে ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারেন না। পুরাতন বাড়ি মেরামতও করতে পারেন না। অনেক ঘরবাড়িই অস্বাস্থ্যকর। পরিবারের সবাইকে একটি ঘরে বাস করতে হয়।

৪. স্বাস্থ্য	দেশের বেশির ভাগ মানুষই চিকিৎসার সুযোগ পায় না। বিভিন্ন রোগে ভোগে। চিকিৎসার অভাবে অনেকে অকালে মারা যায়।
৫. শিক্ষা	দেশের অনেক শিশু বেশি দূর শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না। পরিবারে বেশি লোক হলে মা বাবার সীমিত আয়ে সংসার চলে না। এ জন্য অল্প বয়সে শিশুদের অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজ করতে হয়।

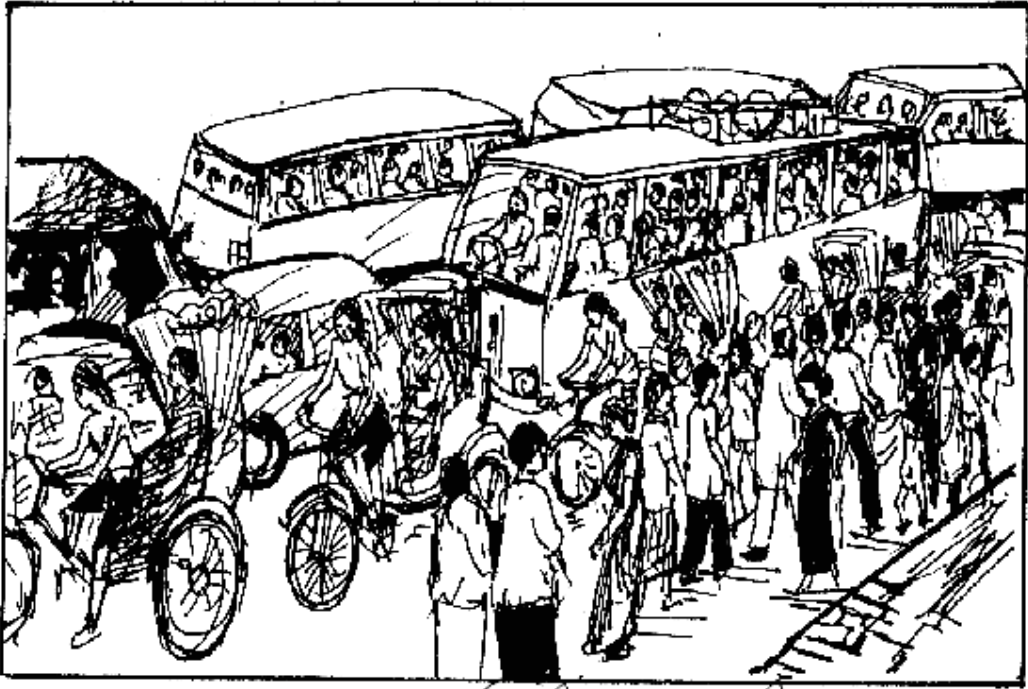
জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের সমাজ ও পরিবেশে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন-

- ১। **অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট :** জনসংখ্যা বেড়ে গেলে মানুষ ও যানবাহন চলাচল বাড়ে। ফলে রাস্তাঘাট নোংরা হয়।
- ২। **আবর্জনা সমস্যা :** মানুষ বাড়ার ফলে হাটবাজার, রাস্তাঘাট, শহর বন্দরের যেখানে সেখানে বসতি গড়ে ওঠে। এসব মানুষ যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে ও আবর্জনা ফেলে।



চিত্র : ৭.১ : আবর্জনার স্তূপ

- ৩। **বসতি সমস্যা** : অভাব অনটনের কারণে কাজের জন্য মানুষ শহরে আসে। এর ফলে শহরের বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে ওঠে। বসতিগুলো নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। বসতিগুলোতে অনেক অসামাজিক কাজ হয়।
- ৪। **অপরিকল্পিত ঘরবাড়ি** : লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে মানুষ যেখানে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে। এভাবে গড়ে ওঠা ঘরবাড়িতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকে না। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।
- ৫। **যানবাহনজনিত সমস্যা** : জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দেশে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায়। যানবাহনের ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষিত হয়। এছাড়া যানবাহনগুলো অতিরিক্ত যাত্রী বহন করে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।



চিত্র ৭.২ : অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই যানবাহন

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শহরে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন রাস্তায় চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ জন্য রাস্তায় চলাচল করার নিয়ম-কানুন মেনে চলা প্রয়োজন। আমরা সাবধানে রাস্তায় চলাচল করব। রাস্তা চলাচলে ট্রাফিক নিয়ম-কানুন মেনে চলব। রাস্তা পারাপারের সময় লালবাতি জ্বললে যানবাহন থামবে। তখন জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হব। সব সময় ফুটপাথ অথবা রাস্তার পাশ দিয়ে চলাচল করব। প্রয়োজনে ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য নেব।

৬. আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা : জনসংখ্যা বাড়ার ফলে কাজের সুযোগ কমে যায়। ফলে দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন ইত্যাদি বেড়ে যায়। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এসব সমস্যা নিরসনের জন্য আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা সবাই সচেতন থাকব।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের-----খুবই কম।
- খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন-----সৃষ্টি হচ্ছে।
- গ. মানুষের কতকগুলো-----চাহিদা রয়েছে।
- ঘ. পরিবারে-----বাড়লে বেশি খাবারের প্রয়োজন হয়।
- ঙ. রাস্তা পারাপারের সময়-----জ্বললে যানবাহন থামবে।

২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

ক. আমাদের দেশে ১৯৮১ সালে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৮৩৪ জন।

খ. বসতিগুলোতে অনেক অসামাজিক কাজ হয়।

গ. দেশের বেশিরভাগ মানুষই চিকিৎসার সুযোগ পায়।

ঘ. জনসংখ্যা বেড়ে গেলে দেশে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায়।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

(ক) আমরা জানি চীন দেশে	অকালে মারা যায়
(খ) অনেক মা বাবা ছেলেমেয়েদের	আমাদের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি
(গ) চিকিৎসার অভাবে অনেকে	শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না
(ঘ) পার্শ্ববর্তী সব দেশের তুলনায়	মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করে
(ঙ) দেশের অনেক শিশু বেশি দূর	জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি
	প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় কিনে দিতে পারেন না।

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ গত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে কত কোটি মানুষ বেড়েছে?

ক. প্রায় পাঁচ কোটি

খ. প্রায় সাত কোটি

গ. প্রায় আট কোটি

ঘ. প্রায় দশ কোটি।

৪.২ আমরা পুষ্টিহীনতায় ভুগি কেন?

ক. প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে

খ. চিকিৎসার অভাবে

গ. বস্ত্রের অভাবে

ঘ. শিক্ষার অভাবে।

৪.৩ ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?

ক. ৬২৪ জন

খ. ৭৫৫ জন

গ. ৮০৪ জন

ঘ. ৮৮১ জন।

৪.৪ কেন ছেলেমেয়েদের ছেঁড়া জামা-কাপড় পরতে হয়?

- ক. পরিবারে লোকসংখ্যা কম হলে খ. পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি হলে
 গ. জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হলে ঘ. দেশের আয়তন কম হলে।

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে?
 খ. অধিক জনসংখ্যা বাসস্থানের ওপর কী কী বিরূপ প্রভাব ফেলে?
 গ. দেশের অনেক শিশু বেশি দূর শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না কেন?
 ঘ. জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সমাজ ও পরিবেশে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয়?
 ঙ. রাস্তায় চলাচলের সময় আমরা কী কী নিয়ম মেনে চলব?

অধ্যায় আট

আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

প্রাচীন কাল

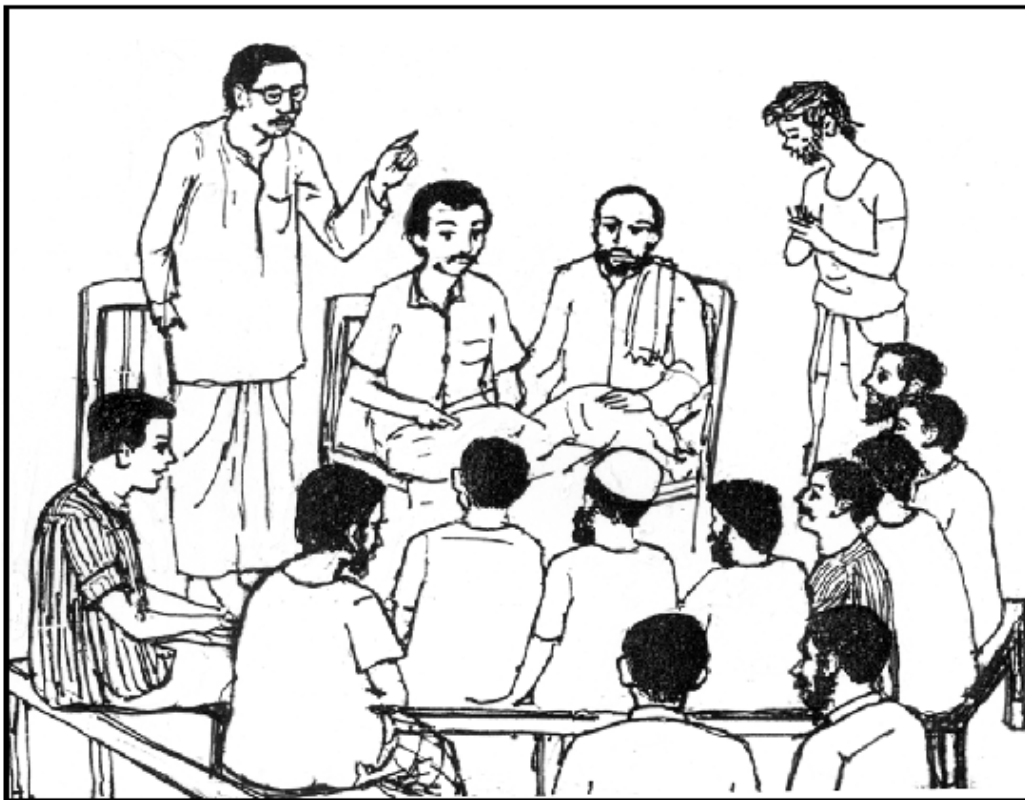
আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধিবাসী। বাংলাদেশ ‘বাংলা’ নামক ভূখণ্ডের পূর্ব অংশে অবস্থিত। আগে এর নাম ছিল পূর্ব বঙ্গ। বাংলার পশ্চিম অংশ পশ্চিম বঙ্গ নামে পরিচিত। এটি ভারত রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ।

প্রাচীন কালে বাংলা নামে অখণ্ড কোন দেশ ছিল না। বর্তমানের ‘বাংলা’ অঞ্চল অর্থাৎ ‘বাংলাদেশ’ ও ‘পশ্চিম বঙ্গ’ কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জনপদের আলাদা নাম ছিল। এগুলো হচ্ছে- বঙ্গ, সমতট, গৌড়, পুন্ড্র, হরিকেল ও রাঢ়। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে এসব জনপদকে একটি শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। চৌদ্দ শতকে এ অঞ্চলকে ‘বাজালাহ’ নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে এর নাম বাংলা হয়। প্রাচীনকালে বাংলার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। আমরা এখন এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

সামাজিক অবস্থা

প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় অসংখ্য গ্রাম গড়ে ওঠে। গ্রামের সমাজ জীবন ছিল সহজ ও সরল। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলার বেশির ভাগ মানুষই কৃষক ও জেলে। এছাড়া প্রতিটি গ্রামে তাঁতী, কামার, কুমোর, নাপিত, ধোপা, মুচি প্রভৃতি পেশার মানুষ বাস করত। প্রতিটি গ্রামে ‘পঞ্চগয়েত’ চালু ছিল।

গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পঞ্চগয়েত গঠিত হত। পঞ্চগয়েতের মাধ্যমে গ্রামের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার সবই হত পঞ্চগয়েতের মাধ্যমে। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন নিজ গ্রাম থেকেই মিটে যেত। এ জন্য এসব গ্রামকে বলা হত ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ’ গ্রাম।



চিত্র : ৮.১ পঞ্চায়েতের বিচার সভা

এখন নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

গ্রামে যেসব পেশার মানুষ বাস করত	
১.	৫.
২.	৬.
৩.	৭.
৪.	৮.

প্রতিটি গ্রামে মানুষ মিলেমিশে বসবাস করত। গ্রামগুলোতে সারা বছর নানা রকম অনুষ্ঠান ও উৎসব হত। এসব অনুষ্ঠান ও উৎসবে নাচ, গান ও বাজনায় মানুষ আনন্দে মেতে থাকত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার মাটি উর্বর। জলবায়ু ছিল কৃষিকাজের উপযোগী। লোহার ফলকযুক্ত কাঠের লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হত। গরু ও মহিষ লাঙল টানার কাজে ব্যবহৃত হত। ধান ও আখ ছিল প্রাচীন বাংলার প্রধান ফসল। মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। এ জন্য প্রচুর ধানের চাষ হত। নদী ও খাল-বিলে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ। মিষ্টি জাতীয় খাবার মানুষের খুব প্রিয় ছিল। আখের রস দিয়ে চিনি ও গুড় তৈরি করা হত। প্রাচীন বাংলায় যব, বিভিন্ন জাতের ডাল ও তেল বীজের চাষ হত। ডালের মধ্যে মসুর আর তেল বীজের মধ্যে তিল ও সরিষা ছিল প্রধান। বিভিন্ন রকম মসলা উৎপন্ন হত। তখন নানা রকম অর্থকরী ফসলের চাষ হত। পাট ও কার্পাস তুলা ছিল প্রধান অর্থকরী ফসল। উৎপাদিত তুলা দিয়ে কাপড় বোনা হত। রেশম চাষ হত।

কৃষি কাজের সাথে সাথে প্রাচীন বাংলায় নানা রকম কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। এসব কুটির শিল্পে প্রধানত তুলা ও রেশমের সুতা দিয়ে কাপড় বোনা হত। পাটের সুতা দিয়েও কাপড় তৈরি হত।

প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রচলন ছিল। নদী ও সমুদ্র পথে কাপড়, মসলা ও সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে দেশী ও বিদেশী বণিকরা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকরা আসতেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও ব্যবসায়ীরা বাংলায় আসতেন। ব্যবসা বাণিজ্য প্রথম দিকে কড়ির প্রচলন ছিল। পরে তামা, রূপা ও সোনার মুদ্রা চালু হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে বন্দর ও গঞ্জ গড়ে ওঠে। এখন নিচের ছকটি খাতায় তুলে নিয়ে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লিখি।

প্রাচীন বাংলার ফসল	কুটির শিল্পে কাপড় বোনার সুতা	ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহৃত মুদ্রা
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.

ধর্মীয় অবস্থা

আদি কাল থেকে বাংলার মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা জীবিত থাকে বলে তারা বিশ্বাস করত। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করত। দেব-দেবী ভেবে সূর্য, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ইত্যাদির পূজা করত। বিভিন্ন পশুরও পূজা করত। এসব পূজায় তারা চাল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান ইত্যাদি ব্যবহার করত। আলপনা আঁকত এবং শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিত।

পরবর্তী কালে প্রাচীন বাংলায় অনেক ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটে। এগুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্ম, জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু হয় বলে জানা যায়।

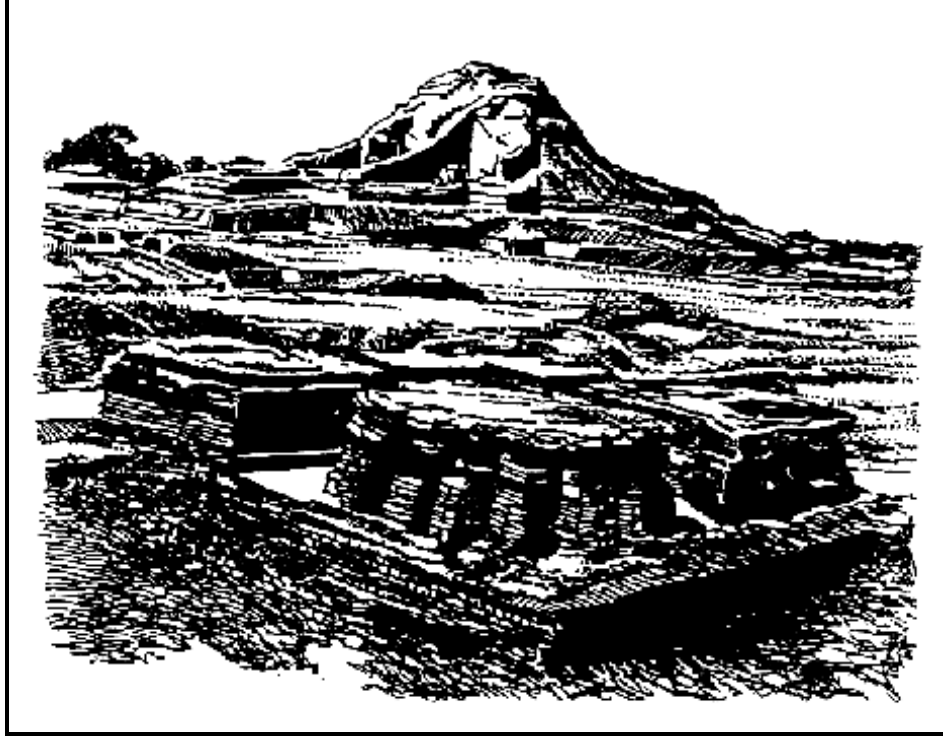
বৈদিক ধর্ম

আর্যদের আসার পর ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মের যাত্রা শুরু হয়। কালক্রমে বাংলায় এ ধর্মের প্রসার ঘটে। বেদ এ ধর্মের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ। বৈদিক ধর্মকে সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মও বলা হয়।

বাংলার আদিবাসীদের মত আর্যরা প্রকৃতির পূজারী ছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও জীবকে তারা দেব-দেবী হিসেবে পূজা করত। প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দির গড়ে ওঠে। মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি রাখা হত। আর আয়োজন করা হত পূজার অনুষ্ঠান। পূজায় দেবতা ও দেবীদের উদ্দেশ্যে ফুল, ফল ও নানা রকম খাবার উৎসর্গ করা হত।

জৈন ধর্ম

মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচার করেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বলে তারা বিশ্বাস করত। বৈদিক ধর্মের মত কঠোর নিয়ম-কানুন এ ধর্মে ছিল না। প্রাচীন বাংলায় কিছু মানুষের মধ্যে এ ধর্ম বিশেষ সমাদর লাভ করে। জৈনদের উপাসনালয়কে ‘বিহার’ বা ‘মঠ’ বলে।



চিত্র: ৮.২ পাহাড়পুর বিহার

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক। বৌদ্ধ ধর্মের নিয়ম-নীতি সহজ সরল। এ ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে ‘অহিংসা পরম ধর্ম’। তাদের নিকট জীব হত্যা মহাপাপ। প্রাচীন কালে বাংলার সাধারণ মানুষের অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। আরাধনা ও জ্ঞান চর্চার জন্য বৌদ্ধগণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ‘বিহার’ গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে বর্তমান কুমিল্লা জেলার ময়নামতির ‘শালবন বিহার’ ও নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের ‘সোমপুর বিহার’ উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম ধর্ম

প্রাচীন কাল থেকে বাংলার সাথে আরব দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। বহু পূর্ব থেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ বাংলায় আসতে শুরু করেন। প্রচলিত আছে যে অনেক সূফী, দরবেশ বাংলায় আসেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী, শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার, বাবা আদম শহীদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব ধর্ম

প্রাচীন কালের শেষ দিকে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এ ধর্ম মতের অনুসারীগণ কৃষ্ণকে দেবতা এবং রাধাকে দেবী হিসেবে বিশেষভাবে মান্য করে। কৃষ্ণ ও রাধার পূজা উপলক্ষে তারা আনন্দময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখন নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

প্রাচীন বাংলার মানুষের ধর্মীয় অবস্থা	
ধর্মের নাম	প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
১.	
২.	
৩.	
৪.	

বাংলার সংস্কৃতি

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদে সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি হয়। তবে সংস্কৃতির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। নিচের ছকে এগুলো আমরা জানব :

	প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
১. খাদ্য	ভাত ও মাছ ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য। এরা মাংস, ডাল এবং শাকসব্জিও খেত। দুধ ও দুধ থেকে তৈরি নানা রকম খাবার ছিল তাদের খুব প্রিয়। এছাড়া গুড়, খই, মুড়ি, চিড়া এবং তাল, নারকেলসহ বিভিন্ন ফলও ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য।
২. পোশাক	প্রাচীন কালে বাংলার পুরুষদের প্রধান পোশাক ছিল ধুতি। মেয়েরা শাড়ি পরত। মাথায় খোঁপা করত। তারা আলতা, সিঁদুর ও কুমকুম ব্যবহার করত। সোনা ও রূপার তৈরী বিভিন্ন অলংকার তাদের খুব প্রিয় ছিল।

৩. খেলাধুলা	প্রাচীন বাংলায় নানা রকম খেলাধুলার প্রচলন ছিল। পুরুষদের নিকট গোলাছুট, নৌকাবাইচ, হা-ডু-ডু, কুস্তি ও লাঠি খেলা ছিল খুব প্রিয়। মেয়েদের প্রিয় ছিল কড়ি, গুটি, কানামাছি ও বাঘবন্দী খেলা। সে সময় পাশা খেলারও প্রচলন ছিল। নারী-পুরুষ উভয়ে এ খেলা খেলত।
৪. উৎসব অনুষ্ঠান	প্রাচীন বাংলায় অসংখ্য উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ষষ্ঠি, গায়ে হলুদ, পানখিলি ইত্যাদিও ছিল প্রিয় উৎসব-অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে নাচ ও গানের আয়োজন হত। আর ঢাক, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি বাজান হত।

বাংলার লোক-ঐতিহ্য

প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের গান, ছড়া, শিল্পকলা ইত্যাদি। এগুলো বাংলার লোক ঐতিহ্যের প্রধান দিক।

গান

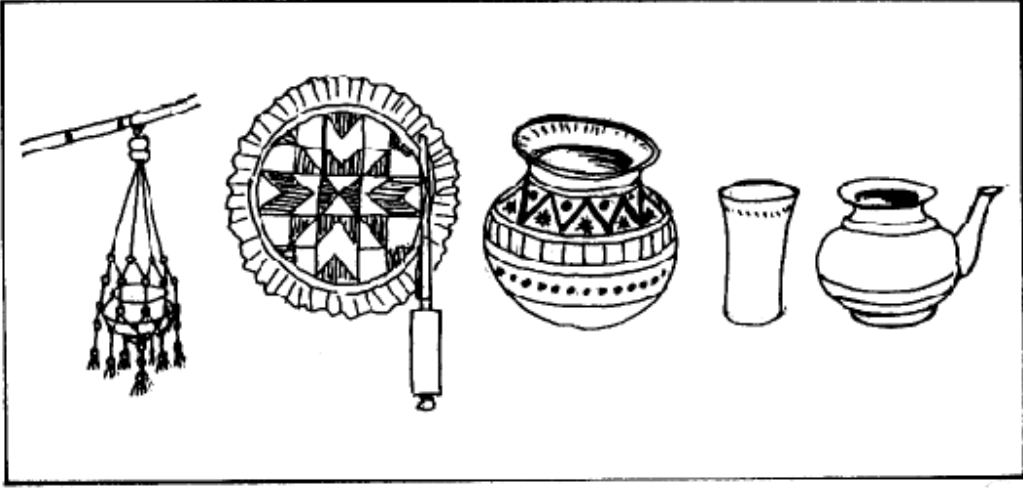
প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য গান প্রচলিত রয়েছে। এসব গানকে লোক সংগীত বলা হয়। এ গান মুখে মুখে রচিত। লোকের মুখে মুখে তা প্রচলিত ছিল। সে সময়ের উল্লেখযোগ্য গানগুলো হচ্ছে বাউল, ঝাঁপান, কীর্তন, পাঁচালি ইত্যাদি।

ছড়া

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় অসংখ্য লোকছড়া প্রচলিত ছিল। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এসব ছড়া রচিত হয়।

শিল্পকলা

পাটের তৈরী শিকা ও তালপাতার তৈরী পাখা ব্যবহার করা হত। মাটির তৈরী কলস, হাঁড়ি,



চিত্র ৮. ৩ : পাটের শিকা, হাতপাখা, মাটির হাঁড়ি পাতিল, তামা কাঁসার তৈজসপত্র।

পাতিল, ফুলদানি, খেলনা ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রূপা, কাসা, তামা ইত্যাদি দিয়ে মানুষ তৈজসপত্র তৈরি করত। এগুলোর গায়ে নকশা করত। এছাড়া তৈরী জিনিসে ছবি আঁকত। বিভিন্ন স্থানে আলপনাও আঁকত। এগুলো আমাদের লোক শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা আরও জানব।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. বাংলাদেশ 'বাংলা' নামক ভূখণ্ডের-----অংশে অবস্থিত।
- খ. প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় অসংখ্য----- গড়ে ওঠে।
- গ. ধান ও আখ ছিল প্রাচীন বাংলার-----ফসল।
- ঘ. বাংলার আদিবাসীদের মত আর্যরা-----পূজারী ছিল।
- ঙ. প্রাচীনকালে বাংলার পুরুষদের প্রধান পোশাক ছিল-----।

২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. প্রাচীন বাংলায় পঞ্চগয়েতের মাধ্যমে গ্রামের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত।
 খ. প্রাচীন কালে বাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল গমের রুটি ও মাংস।
 গ. প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যে প্রথম দিকে সোনার মুদ্রা প্রচলিত ছিল।
 ঘ. বৈষ্ণবরা কৃষ্ণ ও রাধার পূজা উপলক্ষে আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করত।
 ঙ. বাউল গান ছিল প্রাচীন বাংলার উল্লেখ্য সংগীত।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. ‘বাজালাহ’ নামকরণ হয়	প্রচার করেন
খ. বৈদিক ধর্মকে	নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক ইত্যাদি
গ. মহাবীর জৈন ধর্ম	কড়ি, গুটি, কানামাছি ও বাঘবন্দী
ঘ. প্রাচীন বাংলার কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে	চৌদ্দ শতকে
ঙ. প্রাচীন বাংলার মেয়েদের প্রিয় খেলা ছিল	সনাতন বা হিন্দু ধর্ম বলা হয়

৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ প্রাচীন বাংলায় লাঙল টানার কাজে কোন কোন পশু ব্যবহৃত হত?

- ক. গরু ও ঘোড়া
 খ. গরু ও মহিষ
 গ. মহিষ ও ঘোড়া
 ঘ. হাতী ও মহিষ।

৪.২ প্রাচীন বাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল কী কী?

- ক. পাট ও কার্পাস তুলা
 খ. পাট ও যব
 গ. যব ও সরিষা
 ঘ. কার্পাস তুলা ও সরিষা।

৪.৩ ‘অহিংসা পরম ধর্ম’ কোন ধর্মের মূল বাণী?

- | | |
|----------|------------|
| ক. বৈদিক | খ. জৈন |
| গ. বৌদ্ধ | ঘ. বৈষ্ণব। |

৪.৪ কোন দেবতা ও দেবীকে বৈষ্ণবরা বিশেষ মান্য করে?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ক. শিব ও দুর্গা | খ. ইন্দ্র ও কালী |
| গ. কৃষ্ণ ও রাধা | ঘ. কৃষ্ণ ও দুর্গা। |

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক. বাংলাদেশ অঞ্চলের ‘বাংলা’ নামকরণ হয় কীভাবে?
- খ. বাংলার গ্রামকে ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ’ গ্রাম বলা হয় কেন?
- গ. প্রাচীন বাংলায় কী কী ফসল উৎপন্ন হত?
- ঘ. বৈদিক ধর্মের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ঙ. প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যের বর্ণনা দাও।
- চ. প্রাচীন বাংলার কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।
- ছ. প্রাচীন বাংলায় ইসলাম প্রচারক কয়েক জন সূফী ও দরবেশের নাম উল্লেখ কর।

অধ্যায় নয়

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। এ যুদ্ধকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নয় মাস ধরে চলে। তবে মুক্তিযুদ্ধের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখন আমরা তা জানব।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। তখন পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। আমাদের বাংলাদেশ তখন ছিল পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদও ছিল বেশি। কিন্তু শাসনক্ষমতা ছিল অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে তারা শোষণ করত। নানাভাবে নির্যাতন করত।

পাকিস্তানের জন্মের শুরু থেকেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর প্রথম বড় আঘাত হানে। এর প্রতিবাদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ‘তমুদ্দুন মজলিশ’ নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এ সংগঠনটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বিভিন্ন সভা ও সমাবেশ করে।

পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের তথা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন, ‘উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছাত্ররা ‘না না’ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে।

দিনে দিনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জোরদার হয়। ঢাকায় ‘রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। ভাষার দাবি আদায়ের জন্য এ পরিষদের ডাকে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। ভাষা আন্দোলন জোরদার করার জন্য সে বছরই প্রতিষ্ঠিত হয় ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। গ্রহণ করা হয় ধর্মঘটনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ

ঘৃণাভরে এ ঘোষণাও প্রত্যাখ্যান করে। তারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ দিন বিক্ষোভের ডাক দেয়া হয়। কিন্তু সরকার এ আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিল ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।



রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রদের মিছিল

২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হতে থাকে। এক পর্যায়ে ছোট ছোট দলে রাজপথে বের হয়ে তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে শ্লোগান দিতে শুরু করে। তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও সফিউরসহ অনেকে শহীদ হন। এ ঘটনায় গোটা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।



রফিক উদ্দীন আহমেদ



আব্দুল জব্বার



আবুল বরকত

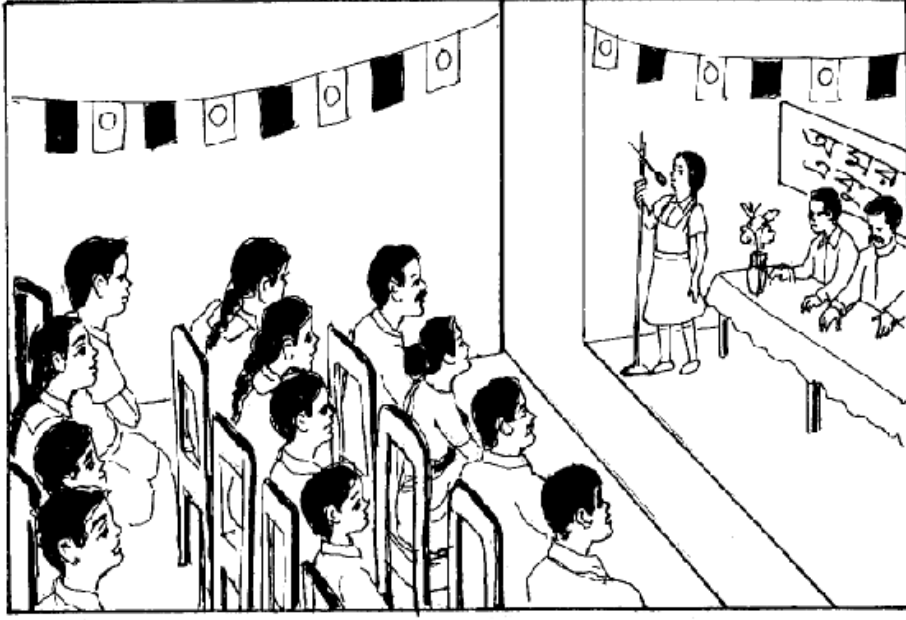
ভাষা আন্দোলনে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাদেরকে আমরা ‘ভাষা শহীদ’ বলি। আর ২১শে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ‘শহীদ দিবস।’ ভাষা শহীদদের আত্মদানের ফলে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়। ভাষা শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। কারণ এখানেই তাঁরা শহীদ হন। এটিই আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। এর অনুকরণে সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার গড়ে উঠেছে।

শহীদ দিবস আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এটি আমাদের একটি জাতীয় দিবস। দেশের মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালন করেন। এ দিনে খুব ভোরে খালি পায়ে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া হয়। আমরাও এ দিন মিনারে ফুল দেব। শহীদ দিবসে সারাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমরাও বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করব।



শহীদ দিবসের ছবি

‘ভাষা আন্দোলন’ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান পটভূমি। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা হয়। এ চেতনাই ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।



শহীদ দিবসে বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ ঘোষণা করে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ভাষা আন্দোলন ছাড়াও অনেকগুলো আন্দোলন করতে হয়। এসব আন্দোলনও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি হিসেবে কাজ করে। এগুলোর মধ্যে ছয় দফা আন্দোলন, এগারো দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব আন্দোলন সম্পর্কে এখন আমরা জানব।

ছয় দফা আন্দোলন

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সরকারের অন্যায় অবিচার ও শোষণের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই শোষণ ও বঞ্চনা অবসানের জন্য সরকারের নিকট তিনি ছয় দফা দাবি পেশ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই ছিল ছয় দফা দাবির প্রধান লক্ষ্য।

হয় দফা দাবি আদায়ের জন্য সারা পূর্ব পাকিস্তানে জোর আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন ‘হয় দফা আন্দোলন’ নামে পরিচিত। পাকিস্তান সরকার এ আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে লাগে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

এগারো দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ১৯৬৯ সালের ৬ই জানুয়ারি ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এগারো দফা দাবি আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ যে আন্দোলন করে তা এগারো দফা আন্দোলন নামে পরিচিত। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। আন্দোলন বানচালের জন্য পাকিস্তান সরকার দমননীতি গ্রহণ করে। এর ফলে ছাত্রনেতা আসাদ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাসহ অনেকে শহীদ হন। এতে ছাত্রদের সাথে সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কিন্তু আইয়ুব খান এ দাবি না মেনে টালবাহানা শুরু করেন। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশের গুলিতে স্কুল ছাত্র মতিউর ও শ্রমিক রুস্তম শহীদ হন। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সরকার বাধ্য হয়ে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ তুলে নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের দেয়া এক গণসংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ খেতাবে ভূষিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এরই মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। এ বিক্ষোভ এক পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থান রূপ নেয়। এ গণঅভ্যুত্থানকে ‘উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান’ বলা হয়। এ গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খান সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ক্ষমতা লাভের দিনই ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন।

সত্তরের সাধারণ নির্বাচন

দেশবাসীর দাবির মুখে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে সারাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ব্যাপক জয়লাভ করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সুযোগ দিলেন না। তিনি নানা রকম টালবাহানা করতে থাকেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও বাতিল ঘোষণা করেন। এসব ঘটনার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সারাদেশে বিক্ষোভ ও হরতাল চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলন ডাক দেন। এ জনসভায় তিনি বলেন “... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” এ ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাজপথে নেমে আসেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রশাসনিক কাজ চলতে তাকে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও তার সাথে ছিলেন। ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দশ দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের আলোচনা চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারীপুরুষকে হত্যা করা হয়। সে রাতেই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর সেই ঘোষণা সেদিনই চট্টগ্রামের স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। সমগ্র জাতি

মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবী, সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার এবং কৃষক ও শ্রমিকসহ সকলেই বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দেশপ্রেমিক বাঙালিরা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে নানাভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেন। কেবল মুষ্টিমের বিশ্বাসঘাতক মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানীদের সাহায্য করে। তারা এদেশে রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গড়ে তোলে এবং এদেশের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ অনেকে বুদ্ধিজীবী রয়েছেন। এছাড়া পাকিস্তানী সৈন্যরা অসংখ্য মানুষের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে। কিন্তু বাঙালির প্রচণ্ড মনোবলের কাছে হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানী বাহিনী



চিত্র:৯.৪ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করি।

অসংখ্য মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করি। এত ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে শাসনের অবসান হয়।
 খ. ১৯৫২ সালে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।
 গ. ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে জারি করা হয়।
 ঘ. ১৯৬৯ সালে ছাত্রজনতার দফা দাবি তীব্র রূপ ধারণ করে।
 ঙ. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

২। নিচের শূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।
 খ. খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল।
 গ. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিল ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে
 ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।
 ঘ. শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে এগারো দফা দাবি পেশ করেন।
 ঙ. নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হন।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে	আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান পটভূমি
খ. শহীদ দিবসে সারা দেশে	শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা পেশ করেন।
গ. ১৯৬৬ সালে	পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ৫৬ শতাংশ ছিল।
ঘ. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে	ইয়াহিয়া খান গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন।
ঙ. ভাষা আন্দোলন	বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ কে ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে এক বক্তৃতায় বলেন ‘উর্দু’ হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা?

ক. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

খ. লিয়াকত আলী খান

গ. খাজা নাজিমুদ্দীন

ঘ. আইউব খান

৪.২ পাকিস্তানের কত ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা ছিল?

ক. শতকরা ৪৭ ভাগ

খ. শতকরা ৫০ ভাগ

গ. শতকরা ৫৬ ভাগ

ঘ. শতকরা ৬৫ ভাগ

৪.৩ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কোন দল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে?

ক. মুসলিম লীগ

খ. আওয়ামী লীগ

গ. পিপলস পার্টি

ঘ. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

৪.৫ ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

ক. ঢাকায়

খ. ভারতে

গ. চট্টগ্রামে

ঘ. চট্টগ্রামের কালুরঘাট

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. কোন যুদ্ধকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বলা হয়?

খ. ভাষা আন্দোলনের প্রধান ঘটনাগুলো উল্লেখ কর।

গ. শহীদ দিবস আমরা কী কী করব?

ঘ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাগুলো উল্লেখ কর।

ঙ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

চ. কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় বর্ণনা কর।

ছ. কীভাবে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র লাভ করি?

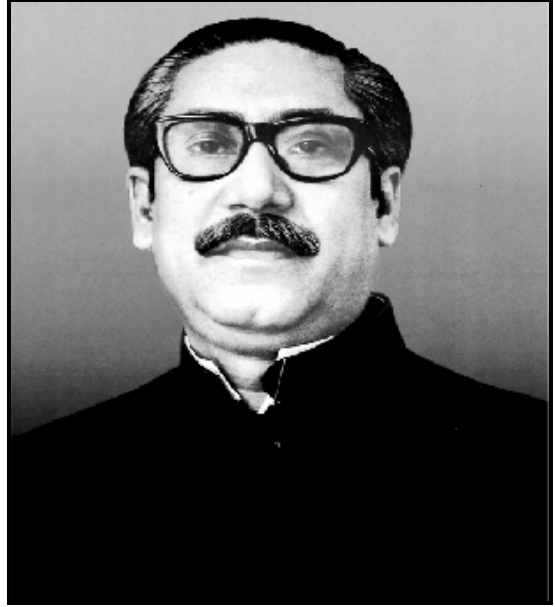
অধ্যায় দশ

স্বাধীনতার মহানায়ক

১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামের ভেতর দিয়েই আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জাতির জনক হিসেবেও সম্মানিত।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তার জন্ম। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা বেগম।

তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে। এখানে তিনি বেশ ক'জন গুণী শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন। স্কুল জীবনে তিনি ছাত্র কল্যাণসহ ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব উদযাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্কুলের পড়া শেষ করে মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। এই কলেজ থেকে বিএ পাশ করে তিনি ঢাকায় চলে আসেন, ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন যুক্ত থাকার কারণে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৯ সালে মুসলিম আওয়ামী লীগ গঠিত হলে তিনি প্রথম যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তখন তিনি জেলে ছিলেন। পরে

সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ১৯৬৪ সালে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির সনদ ৬ দফা পেশ করেন। তার বিরুদ্ধে নানা মামলা দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার করার পর তার বিরুদ্ধে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ মামলা রুজু করা হয়। এর ফলে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। স্বাধিকার আন্দোলনের এক পর্যায়ে দেশে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঘটে। ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখ তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্র-জনসভায় তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন-একথা সকলেই জানতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠনের সুযোগ না দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ১লা মার্চের অধিবেশন বাতিল করলে বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় স্বাধীনতার ডাক দেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাংক কামান নিয়ে হামলা করলে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে আটক করা হয়। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে জাতি তাঁকে মহানায়ক হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাঁর আহবানে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে নতুন সরকার গঠন করা হলে মুক্তিযুদ্ধ নতুন প্রাণ খুঁজে পায়।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় সূচিত হয়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামিক সম্মেলন সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করে। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। তাতে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল। এগুলো হচ্ছে-গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯৭৪ সালে তিনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়ে বিশ্বের দরবারে এ ভাষার মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক মহান নেতাকে হারিয়েছে। দেশ সম্মুখীন হয়েছে অপূরণীয় ক্ষতির।

অনুশীলনী

১. ঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. সালের ১৭ই মার্চ শেখ মুজিব..... জেলার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
- খ. স্কুল পড়া শেষে মুজিব কলিকাতায় কলেজে ভর্তি হন।
- গ. সালে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে শেখ মুজিব কারাবরণ করেন।
- ঘ. ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব দফা পেশ করেন।
- ঙ. ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দেন।
- চ. ১৯৭৫ সালে আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহীদ হন।

২। নিচের শূন্য উত্তরগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশূন্য উত্তরগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- খ. শেখ মুজিব মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন মাদারিপুরে।
- গ. ১৯৪৯ সালে মুসলিম আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন শেখ মুজিবুর রহমান।
- ঘ. ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।
- ঙ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।
- চ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত সরকার কর্তৃক রচিত সংবিধানে ৪টি মূল নীতি ছিল।

৩। বাম পাশের বাক্যগুলোর সাথে ডান পাশের বাক্যগুলো মিল কর।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির	পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ছিলেন
খ. ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে শেখ মুজিব	অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় মুজিব ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত হন।
গ. ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে	জনক হিসেবে সম্মানিত।
ঘ. ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী হামলা করলে	বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন।
চ. ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে	২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

৪। ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ কাকে জাতির জনক বলা হয়?

- ক. শেরে বাংলা একে ফজলুল হক খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৪.১ শেখ মুজিব কোথায় ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন?

- ক. টুঙ্গিপাড়ায় খ. মাদারীপুরে
গ. গোপালগঞ্জে ঘ. কলকাতায়

৪.৩ বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলা থেকে কত তারিখ মুক্তি পান?

- ক. ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ. ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
গ. ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ঘ. ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

৪.৪ কোন সরকারের আমলে বাংলাদেশ জাতিসংঘ, জেটি নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামি সংস্থার সদস্য লাভ করে?

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

খ. খন্দকার মোশতাক আহমদ

গ. জিয়াউর রহমান

ঘ. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ

৪.৫ কে সর্বপ্রথম জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন?

ক. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গ. জিয়াউর রহমান

ঘ. শেখ হাসিনা

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক) বঙ্গবন্ধুকে কেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বলা হয়?

খ) শেখ মুজিব কলকাতা থেকে ফিরে ঢাকায় কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন?

গ) পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি সনদ কী ছিল?

ঘ) বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা কখন দেন?

ঙ) বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কী ছিল?

অধ্যায় এগার

স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পিছনে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বেশ কয়েকজন নেতা ১৯৭১ সালের আগে আমাদের দেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

**শেরে-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক
(১৮৭৩-১৯৬২)**

ইনি ব্রিটিশ আমলে সমগ্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলার কৃষকের ভূমির মালিকানা ব্যবস্থা করেন, মহাজনী প্রথা বাতিল করেন। এ কারণে শেরে বাংলাকে কৃষকদের বন্ধু বলা হয়। তিনি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বাংলার মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার পথ দেখান। তিনি বাংলা



শেরে-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

ভাষার পক্ষে বিশেষভাবে অবদান রাখেন। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তার সরকার ভেঙে দেয়। তিনি আজীবন বাংলা ও

বাঙালির স্বার্থে কাজ করে গেছেন। তাকে বাংলার বাঘ বা শেরে-এ-বাংলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

বাংলাদেশের জনগণের কাছে গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার বার বার তাঁকে বাধা প্রদান করে। তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হন। সেই সময় ব্রিটিশদের হাতে বন্দী অনেক বাঙালি নেতাকে কারাগার থেকে তিনি মুক্তি দেন। পাকিস্তান হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে। শেখ মুজিবসহ অনেকেই সোহরাওয়ার্দীর উদার গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনায় উজ্জীবিত হন।

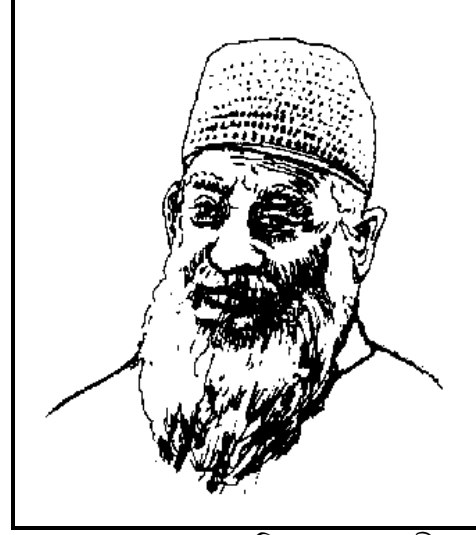


হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

পাকিস্তান আমলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব বাংলার জনগণকে স্বাধীনতার চিন্তায় উজ্জীবিত করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে মুসলিম আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী নামে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই তার জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে এক সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান। ভাসানী ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠাতা। মওলানা ভাসানী উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং পরবর্তী সময়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। মওলানা ভাসানী শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে গরিব সাধারণ মানুষের স্বার্থে আজীবন রাজনীতি করেছেন বলে তাকে ‘মজলুম জননেতা’ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।



মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন অগ্রনায়ক

পাকিস্তানের শাসন শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে পূর্ববাংলার জনগণকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামানসহ অসংখ্য নেতাকর্মী এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর পূর্বনির্দেশ মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন। এছাড়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পূর্ব পাকিস্তান প্রধান অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান কমরেড মনি সিংহসহ অনেকেই আন্দোলন সংগ্রামে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষভাবে অবদান রাখেন। অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ এবং কমরেড মনি সিংহ মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী হিসেবে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কামরুজ্জামান দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিবাহিনী প্রধান হন কর্নেল এম এ জি ওসমানি, চিফ অব স্টাফ হন কর্নেল আবদুর রউফ এবং ডেপুটি চিফ পদে নিযুক্ত হন

স্কোয়াড্রন লিডার একে খন্দকার। এছাড়া ১১টি সেক্টরে বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয়। অনেক সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমরা তাঁদের মধ্যে থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, মুক্তিবাহিনী প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী এবং অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমানের জীবনী সংক্ষেপে জানব।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে যে কজন রাজনৈতিক নেতা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানাবাড়ি হচ্ছে কিশোরগঞ্জ জেলার তারাপাশ গ্রাম। নানা গোলাম হোসেন মল্লিক স্বদেশী আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন। নজরুলের পিতার নাম সৈয়দ রইসউদ্দিন এবং মায়ের নাম নূরুনুসা মল্লিক।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পাস করে কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দিন হাই স্কুল থেকে। তবে স্কুলে পড়ার সময় তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সঙ্গে কথা বলার। রাজনীতি করার ইচ্ছা সেই সময়েই তাঁর মধ্যে জন্ম নেয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে ছাত্রলীগ গঠিত হলে তিনি এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ডাকসুর ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে ক্রিকেট ও হকি টিমের নেতৃত্ব দেন। ভাষা আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সৈয়দ নজরুলের কর্মজীবনের শুরু সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে। সরকারি চাকরি ভালো না লাগায় তিনি ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। পরে আইন পাস করার পর

তিনি ১৯৫৩ সালে ওকালতিতে যোগ দেন। এ বছরই তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলে তিনি পুনরায় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে তিনি উপরাষ্ট্রপতি হন। তবে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তিনি দক্ষতার সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অস্থায়ী সরকারের সাফল্যই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার পর তিনি সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারে নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হলেও তিনি শিল্পমন্ত্রী হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে প্রথমে গৃহবন্দী, পরে জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। ওরা নভেম্বর ভোরবেলা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার অন্যতম সৈয়দ নজরুল ইসলামকে হত্যা করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদ ছিলেন। আমরা সৈয়দ নজরুলের জীবন থেকে দেশ সেবার আদর্শ গ্রহণ করবো।



সৈয়দ নজরুল ইসলাম



তাজউদ্দীন আহমদ

তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন সহকর্মী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, আদর্শবান সংগঠক এবং তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান জাতি কখনো ভুলবে না।

তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম ২৩ জুলাই ১৯২৫ সালে, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং মায়ের নাম মেহেরুননেসা খানম।

স্কুলে সকল পরীক্ষায় তাজউদ্দীন বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থানের অধিকার হন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও আইন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ পবিত্র কোরআন-এ হাফেজ ছিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি ও সমাজসেবার সাথে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। রাজনীতি ও শিক্ষা তাঁর হাতে হাত ধরে চলেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে ভাষার অধিকারসহ বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। তাজউদ্দীন ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তাদের অন্যতম। ১৯৫৪ সালে তাজউদ্দীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নেন এবং কিছুকাল কারাবরণ করেন। বিখ্যাত ৬ দফার অন্যতম রূপকার ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুণে ইতোমধ্যে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। ১৯৬৬-তে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাজউদ্দীন আহমদ তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান সরকার সত্তরের গণ রায়কে উপেক্ষা করলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্বীর অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাজউদ্দীন এ আন্দোলনে সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ তারিখে পাকিস্তানিরা গণহত্যা শুরু করলে তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকা ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ১০ই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নয় মাস কঠিন অবস্থা মোকাবিলা করে তিনি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন। তিনি মুক্তি বাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসার পর নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তাজউদ্দীন আহমদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর সকালেই তাজউদ্দীনকে গৃহবন্দী করা হয় এবং পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ভোর বেলা অন্য তিন জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানের সঙ্গে তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

তিনি ছিলেন এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কাভারী। আমরা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অগ্রপথিক তাজউদ্দীনের হত্যাকারীদের ঘৃণা করব, তাজউদ্দীনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

এম এ জি ওসমানী (১৯১৮-১৯৮৪)

এম এ জি ওসমানী ছিলেন মুক্তি বাহিনীর প্রধান। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জে। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর মফিজুর রহমান। ওসমানী স্কুলে পড়া শেষে ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানেই তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কমিশন লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন।



এম. এ. জি. ওসমানী

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি শেষে ১৯৬৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। ২৫ মার্চ-এর পর তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান করা হয়। এরপর মুক্তিবাহিনী নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে তাঁর মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগান। স্বাধীনতা লাভের পর এম এ জি ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান পদে উন্নীত করা হয়। তবে অচিরেই তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও জয়লাভ করেন এবং মন্ত্রী হন। ১৯৭৫ সালে তিনি সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি জাতীয় জনতা পার্টি গঠন করেন। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি পদে তিনি বিরোধী মোর্চার প্রার্থী হন। তিনি খুবই স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। ১৯৮৪ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি এম এ জি ওসমানী লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান কখনো ভুলবার নয়।

জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১)

জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়া জেলার বাগবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মনসুর রহমান এবং মায়ের নাম জাহানারা খাতুন। তিনি ১৯৫২ সালে করাচি থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। ঐ বছর তিনি করাচি ডি. জে কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানেই তিনি ১৯৫৩ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের দ্বিতীয় কমান্ডার



শহীদ জিয়াউর রহমান

হিসেবে বদলি হন। সেখানে থাকা

অবস্থাতেই বাঙালি অন্য সৈনিকদের মতো তিনিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে মেজর জিয়াউর রহমান দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। ১০ এপ্রিল অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার পর কর্নেল এম এ জি ওসমানীনের নেতৃত্বে যে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় তাতে তিনি ১নং সেক্টর কমান্ডার এবং জেড ফোর্সের দায়িত্ব পান। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ‘বীর উত্তম’ খেতাব প্রদান করা হয়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহীদ হওয়ার পর জিয়াউর রহমান প্রথমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সামরিক বিদ্রোহের পর তিনি সামরিক উপ-প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি সামরিক আইন প্রশাসক হন এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি

রাজনৈতিক দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন।

জিয়াউর রহমান কৃষি ক্ষেত্রে খাল কাটা কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। তিনি সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩০মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তিনি সেনাবাহিনীর একটি বিক্ষুব্ধ অংশের হাতে নিহত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের জন্য তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. শেরে বাংলা কৃষকদের মালিকানার ব্যবস্থা করেন।
- খ. সোহরাওয়ার্দী জনগণের কাছে গণতন্ত্রের হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
- গ. ভাসানীকে বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।
- ঘ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রবাসী সরকারের ছিলেন।
- ঙ. তাজউদ্দীন ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম.....
- চ. এম এ জি ওসমানী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছিলেন।

২। নিচের শূন্য উত্তরগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশূন্য উত্তরগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. শেরে-এ-বাংলা ব্রিটিশ আমলে সমগ্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
- খ. ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন।
- গ. ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু প্রেপ্তার হলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী সভাপতি হন।
- ঘ. ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হন।
- ঙ. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার জিয়াউর রহমানকে ‘বীর প্রতীক’ খেতাবে ভূষিত করে।
- চ. মুক্তিযুদ্ধকালে এম এ জি ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক করা হয়।

ক. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ	১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন।
খ. শের-এ-বাংলা একে ফজলুল হক	বঙ্গাবন্ধু পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরেন।
গ. ৩ নভেম্বর ঢাকা জেলখানায়	সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
ঘ. ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে	৪ জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়।
ঙ. ১০ জানুয়ারি ১৯৭২	বঙ্গাবন্ধু সপরিবারে নিহত হন।
চ. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট	স্বাধীনতা লাভ করে।

ঘ. ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল

৪.৫ মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা ভাসানী কী দায়িত্ব পালন করেন

ক. উপদেষ্টা

খ. মন্ত্রী

গ. দূত

ঘ. পরামর্শক

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও

- ক) শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক কীভাবে বাংলার কৃষকদের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন?
- খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কেন?
- গ) মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে ‘মজলুম জননেতা’ উপাধি দেওয়ার কারণ কী?
- ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কী কী দায়িত্ব পালন করেন?
- ঙ) তাজউদ্দীন আহমদকে কেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কাভারী বলা হয়?
- চ) স্বাধীনতা যুদ্ধে এম এ জি ওসমানীর অবদান সম্পর্কে লেখ?

অধ্যায় বার

আদিবাসীদের জীবনধারা

বাংলাদেশে ৪৫টির বেশি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। শত শত বছর থেকে এ দেশে এসব জনগোষ্ঠী বাঙালিদের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এসব জনগোষ্ঠী আদিবাসী নামে পরিচিত। পাহাড়, সমতল ও বনভূমিতে তারা বাস করে।

নিচের ছকে দেশের প্রধান কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম পড়ি।

১।	চাকমা	৬।	মুরং
২।	মারমা	৭।	খাসি
৩।	সাঁওতাল	৮।	হাজং
৪।	গারো	৯।	ওঁরাও
৫।	মণিপুরি	১০।	রাজবংশী

আমরা এখন কয়েকটি আদি জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে জানব

চাকমা

বাঙালির পরে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা। চাকমারা নিজেদের ‘চাঙমা’ বলেন। রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলায় চাকমারা বসবাস করেন। বান্দরবান জেলায়ও এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসাবস করেন।

চাকমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এরা অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের পরিবার পিতৃপ্রধান। চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রধান হচ্ছেন রাজা। যে কোনো ব্যাপারে তার মতামত চূড়ান্ত বলে মানা হয়। চাকমাদের কিছু ভালো গুণ রয়েছে। তারা বিপদে এবং অভাবের সময় একে অপরকে সাহায্য করে। চাকমা সমাজে নানা বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ। এখন আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানব।

গৃহ ও বাসস্থান

চাকমারা গ্রামকে ‘আদাম’ এবং গ্রামের প্রধানকে ‘কারবারি’ বলে। ছোট ছোট নদীর তীরে কম উঁচু পাহাড়ের ওপর খোলামেলা জায়গায় গ্রামগুলো অবস্থিত। শক্ত গাছের ওপর কাঠ ও বাঁশ দিয়ে এরা মাচাঘর বানায়। মাচাঘরে ওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি থাকে। মাচাঘরের সামনে জলের পাত্র রাখার জন্য একটি খোলা ছোট মাচা থাকে। একে ‘ইজর’ বলে। প্রায় সব গ্রামে মন্দির আছে। মন্দিরকে এরা ‘ক্যাং’ বলে। এখন চাকমারা সমতল ভূমিতেও বসবাস করে। তারা লেখাপড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি নানা পেশায় বেশ সুনাম অর্জন করছে।

খাদ্যাভ্যাস

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা ভাতের সাথে মাছ, মাংস ও শাকসবজি খেতে ভালবাসে। শুটকি মাছ খেতে এরা খুব পছন্দ করে।

পোশাক

এরা নিজেদের তাঁতে কাপড় বোনে। এই কাপড় দিয়ে তারা পোশাক তৈরি করে। এই পোশাকে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের ছাপ আছে। চাকমা নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম পিনোন-খাদি। কিশোররা নানা রকম পোশাক পরে। এখন আধুনিক পোশাকেও চাকমারা অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।



চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

পেশা

চাকমারা জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় গাছপালা পুড়িয়ে গর্ত করে বীজ বপণ করে। একে ‘জুম’ চাষ বলে। সমতল ভূমিতে লাঙল দিয়ে চাষ করে বিভিন্ন ফসল ফলায়। চাকমারা পোশাক তৈরি করে। দেশী ও বিদেশীদের কাছে তাদের উলের তৈরি ‘শাল’ ও অন্যান্য কাপড়ের চাহিদা রয়েছে। এরা বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, পাখা, চিরুণি, বাঁশী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে। এদের তৈরি ঝুড়ি দেখতে খুবই সুন্দর।

সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব

চাকমাদের মধ্যে অনেক পূজাপার্বন প্রচলিত আছে। এরা গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মৃত্যু দিনের স্মরণে ‘বৈশাখী পূর্ণিমা’ পালন করে। এছাড়া এরা ‘মাঘী পূর্ণিমা’ পালন করার সময় ‘কঠিন চীবর দানোৎসব’ পালন করে। এদের শ্রেষ্ঠ উৎসব ‘বিজু’। বাংলা বছরের শেষ দুইদিন ও নববর্ষের প্রথম দিন এরা এই উৎসব পালন করে। বিয়ে ও অন্যান্য উৎসবে এরা নাচগান করে। নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

আচার অনুষ্ঠান



বৈশাখী পূর্ণিমা

চাকমাদের অনেক আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। জন্মের পর শিশুর মুখে মধু দেয়া হয়। সাত দিন পর ওঝা ডেকে শিশুর চুল ধুয়ে তাকে পবিত্র করা হয়।

কেউ মারা গেলে মৃতদেহকে সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। মৃতদেহ স্নান করান হয়। এরা মৃতদেহকে আগুনে পোড়ায়। শিশুদের মৃতদেহ কবর দেয়া হয়।

চাকমাদের বিবাহ রীতি চমৎকার। বরযাত্রীরা কনের বাড়ি পৌঁছালে তাদের সাদরে গ্রহণ করা হয়। মেয়েকে বরের বাড়িতে এনে ‘চুঙুলাং’ পূজা শেষে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও ভাষা আছে। নিজেদের মধ্যে তারা এই ভাষায় কথা বলে। তাদের নিজস্ব নাচ গান ও সাহিত্য আছে। রূপকথা, পুরাকাহিনী ও ছড়া প্রচলিত আছে। নাদের খারা, কুস্তি এবং ঘিলা খারা (এক রকম বিচি দিয়ে গুটি খেলা) এদের প্রিয় খেলা। মেয়েরা বউচি খেলতে ভালোবাসে।

চাকমারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। চাকমা ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হবার প্রবণতা বেড়েছে। এদের অনেকেই এখন উচ্চশিক্ষিত ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হচেছন। তারা বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করছে। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিও তারা বেশ যত্নবান।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে চাকমাদের জীবনধারার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ

১।
২।
৩।
৪।
৫।

মারমা

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মারমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলায় অধিকাংশ মারমা বাস করে। এছাড়া কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় রয়েছে মারমাদের বাস। এসব এলাকায় তারা ‘রাখাইন’ নামে পরিচিত।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

মারমা সমাজ প্রিত্বপ্রধান। তাদের সমাজে রাজা আছেন। রাজা সভাসদ দ্বারা সামাজিক বিচার কাজ সমাধা করেন। মারমারা কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে একটি মৌজা হয়। মৌজা প্রধানকে বলে হেডম্যান। আর গ্রাম প্রধানকে বলা হয় ‘রোয়াজা’ বা ‘কারবারি’। রাজার সুপারিশে জেলা প্রশাসক হেডম্যানদের নিয়োগ দেন। মারমারা সমাজে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করে। এরা নাচ, গান ও আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে। মারমা সমাজও নানা বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এখন আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানব।

বাসস্থান

এরা চাকমাদের মত শক্ত খুঁটির ওপর বাঁশ দিয়ে মাচাঘর বানিয়ে বসবাস করে।

খাদ্যাভ্যাস

মারমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। মাছ, মাংস ও শাকসবজি খেতে ভালবাসে। মোরগ-মুরগি ও শূটকি মাছের তরকারি এদের খুবই প্রিয়।

পোশাক

আগের দিনে মারমা পুরুষরা ‘দেয়াহ’ নামে তাঁত বোনা কাপড় পরতেন। বর্তমানে তাঁরা লুজি ও সার্ট পরেন। নারীরা ‘বেদাই আঙগি’ নামের ব্লাউজের সঙ্গে ‘খামি’ (নিচের অংশ) পরেন। মেয়েরা সাজগোজ করতে পছন্দ করে। তারা বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় খোপা বাঁধে। এছাড়া তারা আরাকানি পোশাকও পরে। তারা রূপার তৈরি ‘খাগ্রো’ (কোমরবন্ধনী) ব্যবহার করেন।

পেশা

মারমারা খুবই পরিশ্রমী। এরা জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। নারীরা চাষাবাদ ও সংসারের যাবতীয় কাজ করে। দলবদ্ধভাবে নদীতে মাছ ও কাঁকড়া শিকার করে। এরা কাপড় ও চুরুট তৈরি করে।

সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব

চাকমাদের মত মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলোতে তরুন-তরুণীরা অংশগ্রহণ করে। ধর্মীয় দিনগুলোতে ক্যাং-এ গিয়ে গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

আচার অনুষ্ঠান

শিশু জন্মগ্রহণ করার পর শুভ দিন দেখে শিশুর নাম রাখা হয়। একজন জ্যোতিষী (বৈদ্য) কে নাম নির্বাচনের জন্য ডাকা হয়। মারমা ছেলেরা নিজ গোষ্ঠীর বাইরে কাউকে বিয়ে করতে পারে না। মেয়েরা নিজ গোষ্ঠীর বাইরেও বিয়ে করতে পারে। মারমা সমাজে মেয়েদের পছন্দ অনুযায়ী সাধারণত বর ঠিক করা হয়। এদের বিয়েতে খুব ধুমধাম হয়। বিয়ের দুই দিন আগে বরের বাড়িতে বর-কনের মজাল কামনা করে পূজা করা হয়। এই পূজা ‘চুং-মংলেহ’ নামে পরিচিত।

মারমা সমাজে কেউ মারা গেলে মৃতদেহকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ হলে মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ানো হয়। বর্তমানে মারমারা লেখাপড়া শিখছে। তারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়তে আসছে। চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছে।

সাঁওতাল

সাঁওতালরা দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে বাস করে। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট, ফুলবাড়ি, চিরিরবন্দর, কাহারোল এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জে সাঁওতালরা অধিক সংখ্যায় বাস করে। রাজশাহী এবং বগুড়া অঞ্চলেও কিছু সংখ্যক সাঁওতাল আছে। প্রাচীনকাল থেকেই সাঁওতালরা এ দেশে বসবাস করে আসছে। এরা মোট ১২টি গোত্রে বিভক্ত। সাঁওতালী ভাষায় এ গোত্রগুলো ‘পারিস’ নামে অভিহিত।

বাসস্থান ও পোশাক

এদের ঘরগুলো ছোট এবং মাটির তৈরি। ঘরে সাধারণত কোন জানালা থাকে না। সাঁওতালরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে।

সাঁওতাল পুরুষরা আগে সাদা থান কাপড়ের ধুতি পরতেন। বর্তমানে লুজি, ধুতি ও গেঞ্জি গামছা ব্যবহার করে। নারীরা ‘ফতা’ নামের দুই খন্ডে কাপড় পরেন। বর্তমানে তাঁরা শাড়িও পরেন। পুরুষ সকলে হাতে উকির ছাপ দেয়। মেয়েরা রূপার তৈরি গহনা যেমন বালা, ঝুমকা, আংটি, মল, হাঁসুলি ইত্যাদি ব্যবহার করে। সাঁওতাল নারীরা খোঁপায় ফুল গুঁজতে ভালোবাসে।

অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী সাঁওতালি সমাজে যে বিয়ে হয় তাকে সাঁওতালী ভাষায় ‘ডাঙুয়া বাপলা’ বলে। আগেরদিনে মৃতদেহকে দাহ করার নিয়ম ছিল। বর্তমানে অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশের সকল এলাকায় সাঁওতালরা মরদেহের কবর দেয়।

খাদ্যাভ্যাস

ভাত সাঁওতালদের প্রধান খাবার। মাছ, কাঁকড়া, শূকর, মোরগ, মুরগি, পাখি ও খরগোসের মাংস এদের খুবই প্রিয়।

পেশা

আদিকাল থেকেই কৃষিকে এরা প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। নারী পুরুষ সবাই জমিতে কাজ করে। পুরুষরা হাল চাষ এবং নারীরা বীজ বোনা ও ফসল তোলায় কাজ করে। সাঁওতালরা কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি নিজেরা তৈরি করে। শিকার করার ব্যাপারে এদের উৎসাহ খুব বেশি। জঙ্গল কমে যাওয়ায় তাদের এই পেশায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অনেক সাঁওতাল নারী পুরুষ কুলি, মজুর, মাটি কাটার শ্রমিক ও অন্যান্য কাজ করে।

সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব

সাঁওতালী ভাষায় দেবতাকে বলে ‘বোংগা’। এদের প্রধান দেবতা সূর্য। পাহাড়ের দেবতাকে বলে ‘মারাংমুরো’। এর প্রভাব সাঁওতালদের জীবনে সবচেয়ে বেশি। এ দেবতাকে তারা জন্ম-মৃত্যুর কারণ বলে মনে করে থাকে। সাঁওতালদের গৃহদেবতার নাম ‘বোংগার’। সাঁওতালরা খুব আনন্দপ্রিয়। বিভিন্ন পূজাপার্বণ ও সামাজিক উৎসবে এরা নাচগানে মেতে ওঠে। প্রকৃতির সাথে এদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এরা বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করে

থাকে। সাঁওতালদের বার্ষিক উৎসবের নাম ‘সোহরাই’। এই উৎসবে মেয়েরা দলবদ্ধভাবে নাচে। শীতের শেষে যখন বনে ফুল ফোটে তখন এরা ‘বাহা’ উৎসব উদযাপন করে। এদের একটি জনপ্রিয় উৎসবের নাম ‘দাসাই’।



চিত্র ১১.৫: সাঁওতাল রমণীদের নৃত্য

আচার অনুষ্ঠান

এরা নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলে। এদের জীবন যাপন সহজ ও সরল। বর্তমানে সাঁওতালীদের ওপর বাঙালি সমাজের প্রভাব পড়ছে। এদের অনেকে শিক্ষালাভ করে আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে। ফলে এদের আচার আচরণে পরিবর্তন আসছে।

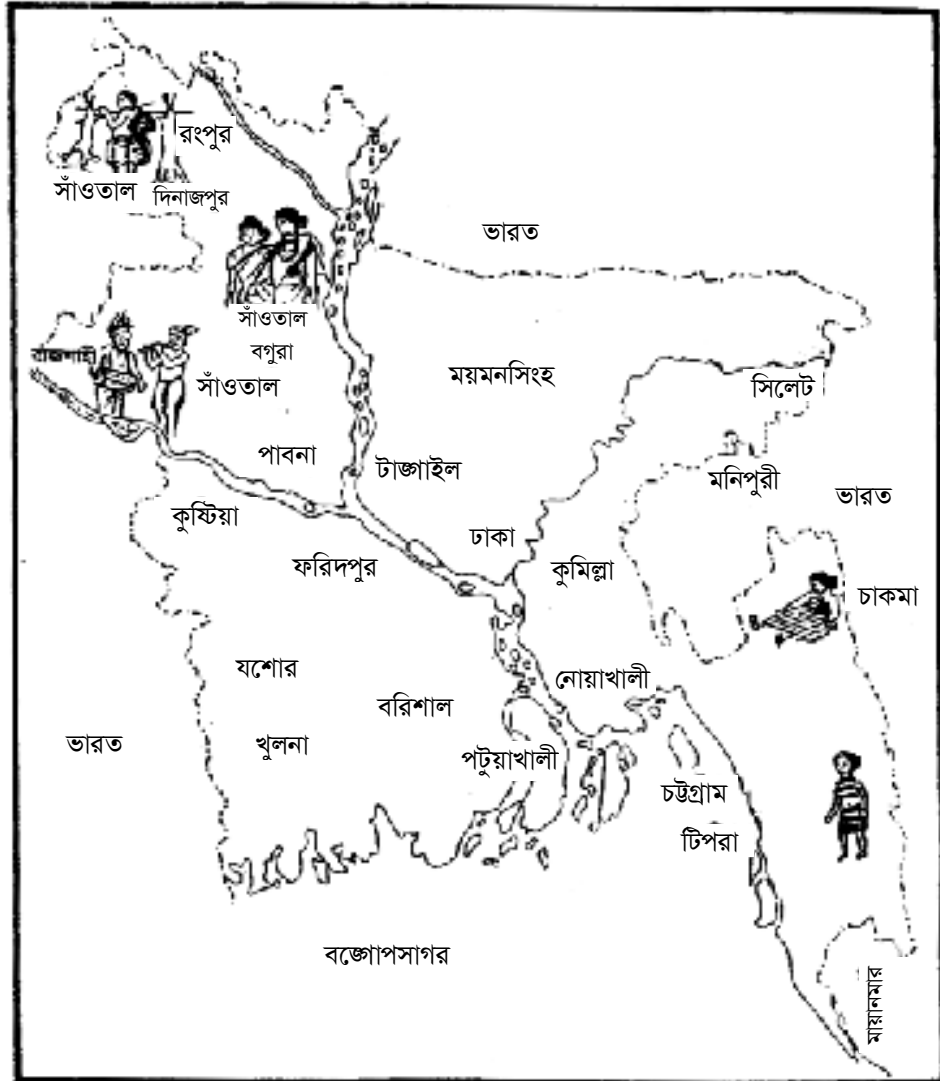
শিল্পকলা

শিল্পকলার প্রতি এদের আগ্রহ রয়েছে। এরা ঢোল, দোতারা, বাঁশি, মেগো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে ও বাজায়। ঘরবাড়ির দেয়ালে ছবি আঁকে। হাঁড়ি কলসির গায়ে চুনকালি দিয়ে নকশা করে।

আমরা সকলে এদেশে মিলেমিশে বাস করব। আদিবাসীরাও বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। এভাবে আমাদের সকলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

আদিবাসীদের বাসস্থান

বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে সমস্ত এলাকায় বসবাস করে মানচিত্রে তা দেখানো হল।



অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বাংলাদেশে বেশি বাস করে।

খ. বাঙালির পরে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী।

গ. মারমারা সমাজ.....।

ঘ. সাঁওতালী ভাষায় দেবতাকে বলে।

ঙ. চাকমারা মজ্জোলীয় বংশের মানুষ।

২। নিচের উক্তিগুলোর যেটি শুদ্ধ তার ডান পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধ তার ডান পাশে 'অ' লেখ।

ক. চাকমারা গ্রামকে আদাম বলে।

খ. মারমা গ্রাম প্রধানকে রোয়াজা বলে।

গ. চাকমারা গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু দিন স্মরণে বিজু উৎসব পালন করে।

ঘ. মারমা মেয়েরা চাষাবাদ ও সংসারের যাবতীয় কাজ করে।

ঙ. সাঁওতালরা বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাস করে।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. পাহাড়ের ওপর খোলামেলা জায়গায়	মারমা বাস করেন
খ. চাকমাদের পোশাকে তাদের নিজস্ব	বিয়ে করতে পারে
গ. বান্দরবান জেলায় অধিকাংশ	সবচেয়ে বেশি
ঘ. মারমা মেয়েরা নিজ গোষ্ঠীর বাইরেও	উৎসব উদযাপন করে
ঙ. মারাংমুরো দেবতার প্রভাব সাঁওতালদের জীবনে	গ্রামগুলো অবস্থিত ঐতিহ্যের ছাপ থাকে

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓)

৪.১ চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব কোনটি?

ক. বৌদ্ধ পূর্ণিমা

খ. সোহরাই

গ. বিজু

ঘ. বাহা

৪.২ অধিকাংশ চাকমা কোন দু'টি জেলায় বাস করে

ক. চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি

খ. রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি

গ. বান্দরবান ও বরগুনা

ঘ. পটুয়াখালী ও খাগড়াছড়ি

৪.৩ কারা রাখাইন নামে পরিচিত?

ক. মারমা

খ. চাকমা

গ. সাঁওতাল

ঘ. গারো

৪.৪ সাঁওতালী ভাষায় বিয়েকে কী বলে?

ক. বাপলা

খ. মাবাংবু

গ. ডাসাই

ঘ. বোজা

৪.৫ শিকার করার ব্যাপারে কাদের উৎসাহ খুব বেশি?

ক. সাঁওতালদের

খ. চাকমাদের

গ. হাজংদের

ঘ. মারমাদের

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক) ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কাকে বলে?

খ) জুম চাষ কী?

গ) চাকমাদের খাদ্যাভ্যাস লেখ।

ঘ) মারমাদের পেশা বর্ণনা কর।

ঙ) সাঁওতালদের চেহারার বর্ণনা দাও।

অধ্যায় তের

শ্রমের মর্যাদা

আমরা বাবা মা, ভাই বোন এক সাথে বাড়িতে বসবাস করি। অনেক সময় পরিবারে দাদা, দাদী, চাচা, ফুপু থাকেন। আমরা সকলে নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার করব। আমাদের বাড়ি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব। পরিষ্কার বাড়ি স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। বাড়ি অপরিচ্ছন্ন হলে বাড়ির পরিবেশ দূষিত হয়। আর দূষিত পরিবেশ জীবনকে করে বিপন্ন। সুস্থ নির্মল পরিবেশ গড়তে হলে বাড়ি ও বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

আমরা প্রতিদিন সকালে উঠে পড়াশুনা করি। পড়া শেষ হলে নিজের পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখব। পড়ার টেবিল ও চেয়ারে ধুলা জমতে দিব না। পড়া শেষে টেবিল চেয়ার মুছে রাখব। আমরা অনেক সময় মাদুরে বসে পড়াশুনা করি। পড়া শেষে মাদুর গুছিয়ে ঘরের এক কোণে রাখব। বইগুলো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখব। বিদ্যালয় থেকে ফিরে নিজ কাপড় চোপড় জুতা গুছিয়ে রাখব। কাগজের টুকরো, ময়লা আবর্জনা ঘরে ফেলব না। ঘরে বুড়ি রাখব। ঘরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করব। সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলব। আমরা প্রতিদিন যা ব্যবহার করি সেগুলোর যত্ন করব। সঠিকভাবে পরিচর্যা করব। নিজের কাজ নিজে করব। অন্যকে কষ্ট দিব না। নিচের ছকটি খাতায় তুলে আমরা কী কী কাজ করব লিখি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

মা বাবাকে বাড়ির কাজে সহযোগিতা করব। বয়স্ক মানুষ অর্থাৎ দাদা-দাদীর যত্ন নেব। তাঁদের কাজ করে দেব। বাড়িঘর পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখতে সর্বদা সচেতন থাকব। এ

কাজে যেমন বড়দের সাহায্য করব তেমনি আবার ছোটদের সাথে কাজ করব। আমরা কোন কাজকে ছোট মনে করব না। কোন কাজে অনীহা দেখাব না। সব কাজ সমান মনে করব। সকল কাজ নিজে করার চেষ্টা করব। সবারকম কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।



চিত্র ১ : বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা

একইভাবে বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখতে যত্নবান হব। এ কাজ সহপাঠীরা দলগতভাবে করব। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, প্রাঙ্গণ নিজেরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব। এসব কাজ আমরা যত্নের সাথে করব। নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে রয়েছে আনন্দ।

অনেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ করার জন্য রয়েছেন ঝাড়ুদার, দস্তরি, দারোয়ান, আয়া, বেয়ারা। ঝাড়ুদার শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ পরিষ্কার রাখেন। দস্তরি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ করেন। ঠিক সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদেরকে শ্রেণীকক্ষে যেতে সাহায্য করেন। দারোয়ান বিদ্যালয় পাহারা দেন। বিদ্যালয়ের আরো অন্যান্য কর্মচারী আয়া, বেয়ারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। শিক্ষক পাঠদান করেন। আমাদের বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে এঁদের সবার শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সবার কাজকে সম্মান করব।

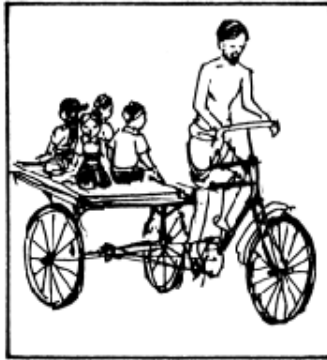
বিদ্যালয়ে কে কী করেন নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

১.	শিক্ষক কী করেন	
২.	দস্তরি কী করেন	
৩.	ঝাড়ুদার কী করেন	
৪.	দারোয়ান কী করেন	

আমরা বিদ্যালয়ে নৌকা, বাস, রিকশা, ভ্যান এবং অন্যান্য যানবাহনে চড়ে যাই। এসবের চালকেরা খুবই কষ্ট করে আমাদেরকে বিদ্যালয়ে আনা নেওয়া করেন। আমরা এদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব।



রিকশার ছবি



ভ্যানের ছবি



নৌকার ছবি

কৃষক পরিশ্রম করে শস্য ফলান। আর আমরা তা খেয়ে বাঁচি। জেলে মাছ সরবরাহ করে আমাদেরকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচান। মিস্ত্রি বাড়িঘর তৈরি করে আমাদের বাসস্থান করে দেন। তাঁতি কাপড় বুনে আমাদের বস্ত্র সরবরাহ করেন। শ্রমিক নানা রকম পণ্য উৎপাদন করে আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটান। দোকানদার বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র বিক্রি করে আমাদের নানা রকম চাহিদা মেটান। গৃহকর্মী বাড়ির কাজে সহযোগিতা করে আমাদের জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলেন।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ কী কী কাজ করেন লিখি।

কৃষক	
জেলে	
দোকানদার	
গৃহকর্মী	

আমরা মানুষের সেবা লাভ করি। তাঁদের সেবা ছাড়া আমরা চলতে পারি না। আমরা শ্রমজীবী মানুষকে ভালবাসব। তাঁদের বিপদের সময় পাশে দাঁড়াব। তাঁদের সাহায্য করব। তাঁদেরকে সব সময় শ্রদ্ধা করব।

শ্রমজীবী মানুষ সমাজকে সুষ্ঠুভাবে চলতে সাহায্য করেন। এঁরা যদি না থাকতেন তাহলে আমরা কেউ সুন্দর জীবনযাপন করতে পারতাম না। আমাদের সবাইকে নিত্যদিনের প্রয়োজনে সমাজের শ্রমজীবী মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। সকল শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা সমান। সমাজে এঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সবাই এঁদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. আমরা কোন কাজকে ----- মনে করব না।

খ. পড়ার টেবিল ও চেয়ারে-----জমতে দিব না।

গ. নিজের কাজ-----করব।

ঘ. আমরা সবার কাজকে-----করব।

ঙ. সকল শ্রমজীবী মানুষের-----সমান।

২। নিচের উক্তিগুলোর যেটি শুদ্ধ তার ডান পাশে 'শু' এবং যেটি অশুদ্ধ তার ডান পাশে 'অ' লেখ।

ক. আমরা সকলে নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার করব।

খ. নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে কোন আনন্দ নেই।

গ. আমরা প্রতিদিন যা ব্যবহার করি সেগুলোর যত্ন করব।

ঘ. জেলে পরিশ্রম করে শস্য ফলায়।

ঙ. কোন কাজে অনীহা দেখাব না।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. পরিষ্কার বাড়ি	পড়াশুনা করি
খ. আমরা প্রতি দিন সকালে উঠে	স্বাস্থ্যের উপযোগী
গ. বিদ্যালয় থেকে ফিরে	মনে করব
ঘ. সব কাজ সমান	নিজ কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখব
ঙ. সব রকম কাজের প্রতি	শ্রদ্ধাশীল হব পরিষ্কার রাখব

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ দূষিত পরিবেশ জীবনকে কী করে?

- | | |
|-----------------|------------|
| ক. বিপন্ন | খ. সুস্থ |
| গ. অস্বাস্থ্যকর | ঘ. নির্মল। |

৪.২ তাঁতি কী করেন?

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ক. দাঁড় টানেন | খ. কাপড় বুনেন |
| গ. মাটির জিনিস তৈরি করেন | ঘ. কাঠের জিনিস তৈরি করেন। |

৪.৩ বাড়ির কাজে সহযোগিতা করে আমাদের জীবনকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে কে সাহায্য করেন?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. জেলে | খ. কৃষক |
| গ. গৃহকর্মী | ঘ. শ্রমিক। |

৪.৪ সমাজকে সুষ্ঠুভাবে চলতে কারা সাহায্য করেন?

- | | |
|-------------------|-------------|
| ক. শ্রমজীবী মানুষ | খ. দোকানদার |
| গ. শিক্ষক | ঘ. চিকিৎসক। |

৪.৫ ঠিক সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের শ্রেণীকক্ষে যেতে কে সাহায্য করেন?

- | | |
|-------------|-------------|
| ক. দারোয়ান | খ. দপ্তরি |
| গ. আয়া | ঘ. বেয়ারা। |

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক. আমরা বাড়িতে কী কী কাজ করি?
- খ. বিদ্যালয়ে আমাদের কে আনা নেওয়া করেন?
- গ. বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কে কী কাজ করেন?
- ঘ. সমাজে সকল শ্রমজীবী মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- ঙ. শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমরা কেমন ব্যবহার করব?

অধ্যায় চৌদ্দ

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিক

রাষ্ট্রের কোন সদস্যকে সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে। নাগরিক হল রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষ। তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেন। রাষ্ট্রের দেওয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি করণীয় কাজগুলো করেন। আমাদের জন্ম বাংলাদেশে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু অধিকার রয়েছে। আবার একই সঙ্গে আমাদের কিছু কর্তব্যও রয়েছে।

নাগরিক অধিকার

নাগরিকের অধিকার বলতে নাগরিকের সুযোগ সুবিধাকে বোঝায়। এসব অধিকার নাগরিকের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

নাগরিক অধিকার সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :

- ১। সামাজিক অধিকার
- ২। রাজনৈতিক অধিকার
- ৩। অর্থনৈতিক অধিকার

আমরা এ পাঠে দুইটি অধিকার সম্পর্কে জানব।

সামাজিক অধিকার

সমাজে জীবনযাপনের জন্য যে সব অধিকার মানুষের অপরিহার্য সে সব অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলে।

প্রধান সামাজিক অধিকারগুলো নিচের ছকে পড়ি।

১। বেঁচে থাকার অধিকার	জীবন রক্ষার অধিকার সকল অধিকারের মূল। নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।
২। সম্পত্তির অধিকার	প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার রয়েছে।
৩। চলাফেরার অধিকার	প্রত্যেক নাগরিকের নিজ দেশের অভ্যন্তরে অবাধে চলাফেরার অধিকার রয়েছে।
৪। মত প্রকাশের অধিকার	চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম অধিকার।
৫। সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার	মাতৃভাষায় কথা বলা আমাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার। একইভাবে সংস্কৃতি চর্চা ও উৎসব অনুষ্ঠান পালন করাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
৬। ধর্মের অধিকার	নিজ নিজ ধর্ম পালন করা প্রত্যেকের নাগরিক অধিকার।
৭। শিক্ষার অধিকার	শিক্ষালাভের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম অধিকার।
৮। কর্মের অধিকার	যোগ্যতা অনুসারে ইচ্ছামত স্বাধীন পেশা লাভের বা কাজ করার অধিকার।

নিচের ছক খাতায় তুলে পাঁচটি সামাজিক অধিকার লিখি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

রাজনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

রাজনৈতিক অধিকারগুলো নিচের ছকে পড়ি

রাজনৈতিক অধিকার	
১। নির্বাচনের অধিকার	এই অধিকার বলতে ভোটদানের এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকারকে বোঝায়।
২। সরকারি চাকরি লাভের অধিকার	যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরি লাভ প্রত্যেকের অধিকার।
৩। আবেদন করার অধিকার	প্রত্যেক নাগরিকের নিজের অভাব অভিযোগ ও সমস্যা জানানোর ও তার প্রতিকারের জন্য আবেদন করার অধিকার আছে।
৪। বিদেশে নিরাপত্তার অধিকার	বিদেশে অবস্থানকালে বিপদে বা সমস্যায় নিজ রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা বা নিরাপত্তা দাবি করার অধিকার।

নিচের ছক খাতায় তুলে ৩টি রাজনৈতিক অধিকার লিখি।

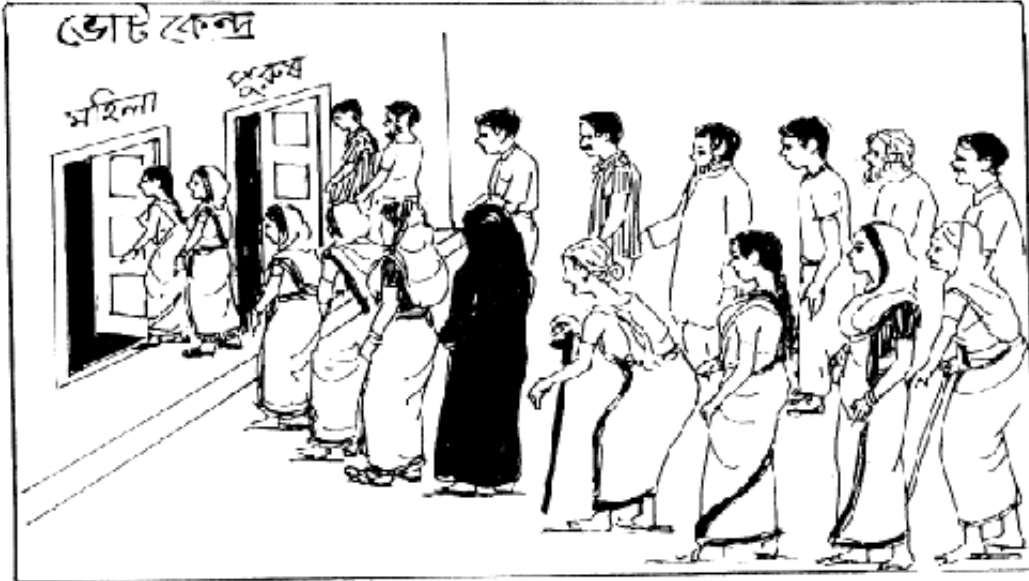
১।
২।
৩।

আমাদের নাগরিক অধিকারগুলো সম্পর্কে আমরা সব সময় সচেতন থাকব।

নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। নাগরিক হিসেবে আমরা রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করি। এই কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে পালন না করলে অধিকার ভোগ করা যায় না।

	নাগরিকের কর্তব্য
১। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য	রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা প্রত্যেক নাগরিকের প্রাথমিক দায়িত্ব।
২। আইন মেনে চলা	শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইন প্রণীত হয়। সুতরাং আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।
৩। নিয়মিত কর প্রদান	নাগরিকের প্রদত্ত কর থেকে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের কর্তব্য।
৪। ভোটদান	এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এর মাধ্যমে নাগরিকগণ শাসনকাজে অংশগ্রহণ করেন। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করা নাগরিকের কর্তব্য।
৫। সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন	রাষ্ট্রীয় কাজে সরকারকে সহযোগিতা করা নাগরিকের কর্তব্য।
৬। সন্তানদের শিক্ষাদান	সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সন্তানদের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করা নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক বাবা-মার দায়িত্ব ও কর্তব্য।



চিত্র ১৩.১ ভোটদান

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. নাগরিকের -----বলতে নাগরিকের সুযোগ সুবিধাকে বোঝায়।
 খ. আমরা ----- নাগরিক।
 গ. জীবন রক্ষার অধিকার সকল অধিকারের-----।
 ঘ. নির্বাচনের অধিকার বলতে ভোটদানের এবং-----প্রার্থী হওয়ার অধিকারকে বোঝায়।
 ঙ. অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের ওপর-----।

২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ।

- ক. আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।
 খ. নাগরিকের অধিকারগুলোকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়।
 গ. নিয়মিত কর দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য।
 ঘ. মাতৃভাষায় কথা বলা আমাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার।
 ঙ. আইন মেনে চলা নাগরিকের অধিকার।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. কোন রাষ্ট্রের সদস্যকে	প্রত্যেকের নাগরিক অধিকার
খ. নিজ নিজ ধর্ম পালন করা	সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে
গ. যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকুরি লাভ	নাগরিকের কর্তব্য
ঘ. রাষ্ট্রীয় কাজে সরকারকে সহযোগিতা করা	প্রত্যেকের অধিকার
ঙ. আমরা যখন বড় হব এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য	বাবা মার দায়িত্ব ও কর্তব্য
	যথাযথভাবে পালন করব

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ কোনটি নাগরিকের সামাজিক অধিকার?

- ক. বেঁচে থাকার অধিকার
 খ. আবেদন করার অধিকার
 গ. পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার
 ঘ. সরকারি চাকরি লাভের অধিকার।

৪.২ কোনটি রাজনৈতিক অধিকার?

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ক. বেঁচে থাকার অধিকার | খ. নির্বাচনের অধিকার |
| গ. বসবাসের অধিকার | ঘ. সম্পত্তির অধিকার। |

৪.৩ কোনটি নাগরিকের প্রথম কর্তব্য?

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ক. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য | খ. নিজ নিজ ধর্মপালন করা |
| গ. প্রচলিত আইন মেনে চলা | ঘ. সরকারি কাজে সহযোগিতা করা। |

৪.৪ সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বাবা-মার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

- | | |
|-------------------------------|---|
| ক. আইন মেনে চলা | খ. সন্তানদের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করা |
| গ. রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা | ঘ. নিয়মিত কর প্রদান। |

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক. নাগরিক কাকে বলে?
- খ. নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?
- গ. সামাজিক অধিকার কাকে বলে? কয়েকটি সামাজিক অধিকারের নাম লেখ।
- ঘ. রাজনৈতিক অধিকার কাকে বলে? কয়েকটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লেখ।
- ঙ. নাগরিকের কর্তব্যগুলো কী?
- চ. অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল কেন?

অধ্যায় পনের

গণতান্ত্রিক মনোভাব

আমাদের প্রত্যেকের পছন্দ অপছন্দ রয়েছে। পছন্দমত কিছু পাওয়ার জন্য আমরা মত প্রকাশ করতে পারি। অপছন্দের বিষয়েও মত প্রকাশ করে জানাতে পারি। আমরা একে অন্যের মতের গুরুত্ব দেব। সকল কাজেই অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করব। অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব বলা হয়।

আমরা বাড়ি, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজেদের মতামত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরব। এতে আমাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব বিকশিত হবে।

বাড়িতে নিজের মত প্রকাশ

বাড়িতে আমরা নানাভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারি। আমাদের বাড়িতে নানা কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবে সকলের পোশাক, খাবার এবং নানা রকম জিনিসপত্র কেনার সিদ্ধান্ত হয়। এসব কিনতে আমরা নিজ নিজ মত প্রকাশ করব। বাড়ির বিভিন্ন ঘর সাজাতে আমাদের মতামত রাখব। বাড়ি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা আমাদের মত প্রকাশ করব। বাড়ির অন্যান্য সকল কাজে আমাদের মতামত রাখব।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে নিয়ে পূরণ করি

বাড়ির যে সব কাজে আমরা মত প্রকাশ করতে পারি
১.
২.
৩.
৪.

বাড়ির অধিকাংশ লোকের মতামতের ভিত্তিতে আমরা এসব কাজে সিদ্ধান্ত নেব।

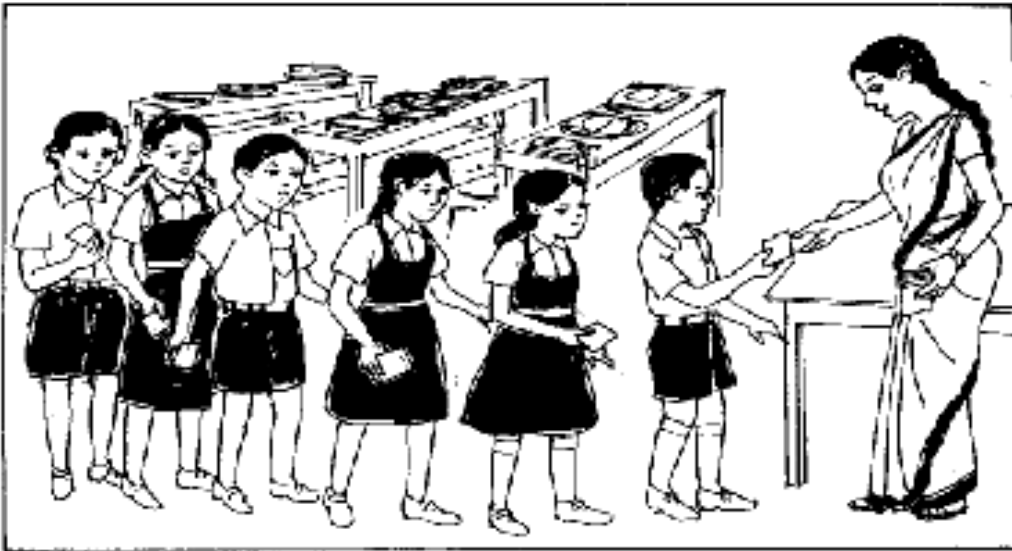
বিদ্যালয়ে নিজের মত প্রকাশ

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজেও আমরা মত প্রকাশ করব। অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী কাজ করব।

আমাদের শ্রেণীতে অনেক সহপাঠী রয়েছে। শ্রেণীর বিভিন্ন কাজ যেমন বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সাজাতে আমরা প্রত্যেকে নিজের মত রাখব। শ্রেণীকক্ষ ছবি এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সুন্দর করে তুলতেও নিজেদের মত রাখব। শ্রেণীকক্ষ সব সময় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় বের করতে আমরা মতামত দেব। অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে এসব কাজে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। এ সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেব।

প্রত্যেক শ্রেণী বা শ্রেণীর প্রত্যেক শাখায় একজন ক্যাপ্টেন থাকা প্রয়োজন। শ্রেণী ক্যাপ্টেন নানা রকম দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন কাজে শিক্ষককে সহায়তা করা তার প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখা, শ্রেণীর শৃঙ্খলা বজায় রাখা তার দায়িত্ব। বিভিন্ন প্রয়োজনে শ্রেণীর ক্যাপ্টেন শ্রেণী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে।

আমরা শ্রেণী ক্যাপ্টেনের গুরুত্ব বুঝতে পারছি। এজন্য যোগ্য কাউকে শ্রেণী ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা দরকার। শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মতের ভিত্তিতে শ্রেণী ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা উচিত। তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা হাত তুলে শ্রেণী ক্যাপ্টেন নির্বাচনের পদ্ধতি জেনেছি। এবার জানব কাগজের টুকরোয় নিজের মত লিখে শ্রেণী ক্যাপ্টেন নির্বাচনের পদ্ধতি।



চিত্র ১৪.১ : শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে শিক্ষকের হাতে কাগজের টুকরো দিচ্ছে

কে কে শ্রেণী ক্যাপ্টেন হতে ইচ্ছুক তা শিক্ষক জেনে নেবেন। যদি একজন ছাড়া আর কেউ ইচ্ছুক না হয় তবে আমরা সকলে তার পক্ষে মত প্রকাশ করব। একজনের বেশি অর্থাৎ কয়েক জন ইচ্ছুক হলে শিক্ষক তাদের নাম বোর্ডে লিখবেন। তারপর তিনি শ্রেণীর সকলকে এক টুকরো কাগজ দেবেন। এ কাগজে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দের একজনের নাম গোপনে লিখব। লেখার পর কাগজটি ভাঁজ করে হাতের মধ্যে রাখব। এখন সারিবদ্ধভাবে তা শিক্ষকের হাতে দেব। সব কাগজের টুকরো শিক্ষকের হাতে গেলে তিনি তা একে একে দেখবেন। যার পক্ষে মত পড়েছে তার নামের পাশে এক একটি দাগ দেবেন। যার নামের পাশে দাগের সংখ্যা বেশি হবে সেই শ্রেণী ক্যাপ্টেন হবে।

পাড়া বা মহল্লায় নিজের মত প্রকাশ

আমাদের পাড়া বা মহল্লায় আমাদের সমবয়সী বন্ধু আছে। আছেন নানা বয়সের অনেক মানুষ। পাড়া বা মহল্লার বিভিন্ন কাজে সকলের মতামত নেব। আমরা পাড়া বা মহল্লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নেব। অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থান নির্বাচন করব। পাড়া বা মহল্লার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি। গাছ লাগানোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করতে পারি। আমরা পাড়া বা মহল্লায় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। এসব কাজে সব সময় আমরা অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি।

আমরা পাড়া বা মহল্লায় যেসব কাজ করব	
১.	
২.	
৩.	
৪.	



চিত্র ১৪.২ : পাড়া বা মহল্লায় বিভিন্ন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বিদ্যালয়, বাড়ি, পাড়া বা মহল্লায় মিলেমিশে থাকা প্রয়োজন। এতে আমরা নানারকম সুফল লাভ করি। মিলেমিশে থাকার জন্য আমরা একে অপরের মতামতকে গুরুত্ব দেব। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান করব। অধিকাংশের মতে বিভিন্ন কাজ করব।

রাষ্ট্রে মত প্রকাশ

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে আমাদের মত প্রকাশের অধিকার আছে। এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে জানব।

নির্বাচন

কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকাংশের মত পাওয়ার জন্য নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে জাতীয় সংসদ রয়েছে। জাতীয় সংসদ দেশের প্রধান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। বড় শহর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পর্যায়ে আরও অনেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ। দেশের সংবিধান ও বিভিন্ন আইনের অধীনে এগুলো গঠিত। জনগণের অংশগ্রহণে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

রাষ্ট্রে ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে সে প্রক্রিয়াকে বলে নির্বাচন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হচ্ছে সরকার গঠনের অন্যতম উপায়। নির্বাচনে প্রত্যেক ভোটার স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোটদানের অধিকার লাভ করে। যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

ভোট

ভোট মতামত প্রকাশের একটি পদ্ধতি। নির্বাচনের জন্য একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে কোন একজনকে পছন্দ করে যে মতামত দেয়া হয় তাই হচ্ছে ভোট। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই দেশের সকল ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ ভোটদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এর মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাই করার অধিকার প্রয়োগ করে। এভাবে জনগণ দেশের শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে।

ভোটার

যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইন অনুসারে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন তাকে ভোটার বলে। আমাদের দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে ভোটার হতে হলে অবশ্যই তার দুইটি যোগ্যতা থাকতে হবে। এগুলো হচ্ছে :

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং

(খ) বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি হতে হবে।

অর্থাৎ বাংলাদেশের নাগরিক ব্যতীত কেউ ভোটার হতে পারবে না এবং বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।

জনপ্রতিনিধি

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। নির্বাচিত ব্যক্তিই হচ্ছে জনপ্রতিনিধি। জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব।

বড় হয়ে আমরা বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হব। আমরা আমাদের পছন্দ মত প্রার্থীকে ভোট দেব। সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রার্থীকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেব। বড় হয়ে কেউ কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হব। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সব সময় কাজ করব। এভাবেই আমরা বাড়ি, বিদ্যালয়, পাড়া বা মহল্লা, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন করব।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. আমরা বাড়ি, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজেদের ---- স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরব।
- খ. শ্রেণী ক্যাপ্টেন নানা রকম ----- পালন করে।
- গ. রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে আমাদের ----- প্রকাশের অধিকার আছে।
- ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ----- হচ্ছে সরকার গঠনের অন্যতম উপায়।
- ঙ. জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির -----।

২। নিচের শুদ্ধ উক্ত্যগুলোর ডান পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধ উক্ত্যগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ।

- ক. অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব বলা হয়।
- খ. প্রত্যেক শ্রেণী বা শ্রেণীর প্রত্যেক শাখায় ক্যাপ্টেন থাকার প্রয়োজন নেই।
- গ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী।
- ঘ. যে কোন বয়সের মানুষ ভোটের হতে পারে।
- ঙ. আমরা সকল কাজে অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করব।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

ক. আমাদের প্রত্যেকের	একে অপরের মতামতকে গুরুত্ব দেব
খ. শ্রেণী ক্যাপ্টেন নানা রকম	ভোটদানের অধিকারী হব
গ. মিলেমিশে থাকার জন্য আমরা	দায়িত্ব পালন করে
ঘ. ভোট মতামত প্রকাশের	পছন্দ অপছন্দ রয়েছে
ঙ. বড় হয়ে আমরা বিভিন্ন নির্বাচনে	একটি পদ্ধতি

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ বাংলাদেশ কোন ধরনের রাষ্ট্র?

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ক. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র | খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র |
| গ. রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র | ঘ. স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র। |

৪.২ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কে দেশের সকল ক্ষমতার অধিকারী?

- | | |
|---------------|------------------|
| ক. রাষ্ট্রপতি | খ. প্রধানমন্ত্রী |
| গ. জনগণ | ঘ. সরকার। |

৪.৩ বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার জন্য বয়স কমপক্ষে কত বছর হতে হবে?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. ১৬ বছর | খ. ১৮ বছর |
| গ. ২০ বছর | ঘ. ২২ বছর। |

৪.৪ বাংলাদেশের প্রধান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কোনটি?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ক. জাতীয় সংসদ | খ. উপজেলা পরিষদ |
| গ. ইউনিয়ন পরিষদ | ঘ. জেলা পরিষদ। |

৪.৫ আমরা বিভিন্ন কাজের সিদ্ধান্ত কিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করব?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ক. নিজস্ব মতের ভিত্তিতে | খ. বন্ধুদের মতের ভিত্তিতে |
| গ. আত্মীয় স্বজনের মতের ভিত্তিতে | ঘ. অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে। |

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- গণতান্ত্রিক মনোভাব কাকে বলে?
- বাড়িতে আমরা কীভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারি?
- শ্রেণী ক্যাপ্টেন নির্বাচনে কাগজের টুকরোয় নিজের নাম লেখা পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- কীভাবে আমরা পাড়া বা মহল্লায় বিভিন্ন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব?
- বাংলাদেশে কী কী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে?
- জনগণ কীভাবে দেশের শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে?

অধ্যায় ষোল

আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ

আমরা প্রতিদিন আমাদের আশেপাশের অনেক কিছু ব্যবহার করি। আমরা জমিতে কৃষিকাজ করি। ঘরবাড়ি তৈরি করি। নদীতে মাছ ধরি। নদীর পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। বন থেকে আমরা কাঠ পাই। রাস্তায় চলাচল করি। বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করি। বিভিন্ন যানবাহনে করে যাতায়াত করি। যেসব বস্তু আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা মেটায় সে সবকে সম্পদ বলে।

সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১। রাষ্ট্রীয় সম্পদ

২। সামাজিক সম্পদ

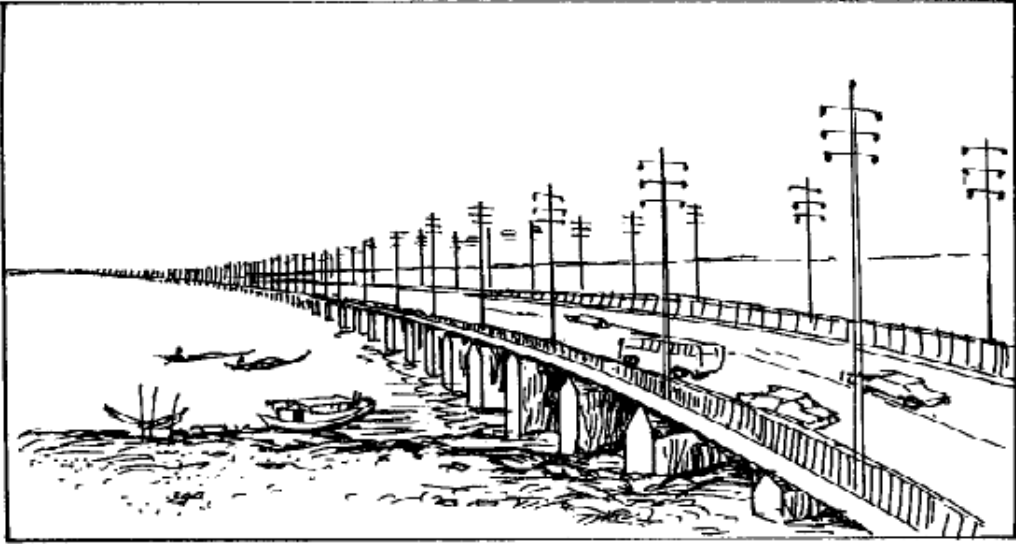
রাষ্ট্রীয় সম্পদ : রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে। রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো সরকার সরাসরি পরিচালনা করেন। দেশের সকল নাগরিকের এ সম্পদ ভোগ করার অধিকার আছে। ভূমি, পানি, বন, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ, সরকারি হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, রেলপথ, রেলগাড়ি, বড়সেতু এসব প্রধান রাষ্ট্রীয় সম্পদ।

সামাজিক সম্পদ : মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে অনেক সম্পদ গড়ে তোলেন। এগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, লাইব্রেরি, পাঠাগার, ক্লাব, পার্ক, খেলার মাঠ, রাস্তা, কালভার্ট, সাঁকো ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পদ ছাড়া ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে যে সম্পদ ভোগ করে তাকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। বসতবাড়ি, জমিজমা, গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি ব্যক্তিগত সম্পদ। মোটরগাড়ি, ট্রাক, বাস, মোটরলঞ্চ, নৌকা, পুকুর, টিউবওয়েল, রিকসা, ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, সাইকেল এগুলোও ব্যক্তিগত সম্পদ।

নিজ এলাকার রাস্তাঘাট উন্নত হলে বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি ইত্যাদি চলাচল করে। আমরা সহজে যাতায়াত করতে পারি। স্থানীয় পণ্য অন্য জায়গায় নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে পারি। কাঁচা রাস্তায় সাধারণত গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি চলাচল করে। এগুলো এলাকায় স্থানীয় মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

নদীবহুল এই দেশে অনেক সেতু, পুল, কালভার্ট, সাঁকো ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। বড় নদীতে সেতু, খালের ওপর পুল, ছোট খালের ওপর কালভার্ট তৈরী হয়েছে। অনেক গ্রামে খাল পারাপারের জন্য সাঁকো আছে। এগুলো সাধারণত বাঁশের তৈরী। বিদ্যালয়, হাটবাজার ও দূরে কোথাও যাওয়ার সময় এগুলো ব্যবহার করি। সেতুর ওপর দিয়ে বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। খেয়া পারাপারে সময় বেশি লাগে। বড়-বৃষ্টির সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের সাঁকো পার হতে কষ্ট হয়। নদীর ওপরে সেতু থাকলে সহজে ও কম সময়ে নদী পারাপার হওয়া যায়।



চিত্র ১৫.১ : একটি বড় সেতু

পানি

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। পান করা, রান্না করা, গোসল করা, হাতমুখ ধোয়া, থালাবাসন পরিষ্কার, কাপড় চোপড় পরিষ্কার, চাষাবাদ

ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে পানির প্রয়োজন। শিল্প ও কলকারখানাতে পানি ব্যবহার করা হয়। আগুন নেভানোর কাজে পানি ব্যবহার করা হয়। আমরা নদী, খালবিল, হাওর, দীঘি, পুকুর, টিউবওয়েল থেকে পানি পাই। আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানিতে জলাশয়গুলো ভরে যায়। বৃষ্টির পানি চাষাবাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। জলাশয়গুলো থেকে আমরা মাছ পাই। পুকুর, দীঘি, হাওর ও অন্যান্য জলাশয়ে আমরা মাছ চাষ করি।

টিউবওয়েল

দেশের অধিকাংশ গ্রামে টিউবওয়েল আছে। টিউবওয়েলকে ‘চাপকল’ও বলে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ টিউবওয়েলের পানি পান করেন। রান্নার কাজে পানি ব্যবহার করি। অন্যান্য কাজেও আমরা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করি। যেসব টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যায় সেসব টিউবওয়েলের পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য এসব টিউবওয়েলের পানি পান করা উচিত নয়।

পুকুর

গ্রামের অনেক বাড়িতে পুকুর আছে। পুকুরের পানিতে গোসল করি। থালাবাসন মাজি। কাপড় চোপড় পরিষ্কার করি। পুকুরে মাছের চাষ করি। পুকুরের পানি আমরা পান করি। তবে পুকুরের পানি ভালভাবে ফুটিয়ে পান করা উচিত।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি। বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা চলতে পারি না। বিদ্যুৎ আমাদের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট আলোকিত করে। ঘরের পাখা চলে। বিদ্যুৎ না থাকলে টেলিফোন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। টেলিভিশন ও রেডিও বিদ্যুৎ শক্তিতে চলে। বিদ্যুৎ ছাড়া কম্পিউটার চালানো যায় না। কলকারখানা চালাতে বিদ্যুৎ লাগে। কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন। রোগ নির্ণয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। চাষাবাদের জন্য সেচযন্ত্র চালাতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। খাদ্যশস্য সংরক্ষণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।

গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। তাপ, আলো, বিদ্যুৎসহ নানা রকম শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। দেশের কলকারখানাগুলোর প্রধান শক্তি প্রাকৃতিক গ্যাস। সার শিল্পের কাঁচামাল গ্যাস। কীটনাশক উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। রান্নার কাজে আমরা গ্যাস ব্যবহার করছি। মোটরগাড়ি ও বেবিট্যাক্সি চালাতে গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বহুবিধ। প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ।

টেলিফোন

টেলিফোন আধুনিক জীবনযাপনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। দেশের মধ্যে ও পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সাথে টেলিফোনে কথা বলা যায়। আমাদের অনেকের নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকেন। অনেকে বিদেশে থাকেন। আমরা তাদের সাথে টেলিফোনে কথা বলি। বর্তমানে মোবাইল ফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে।

পয়ঃনিষ্কাশন

মানুষের মলমূত্র, গোসল ও কাপড় ধোয়া পানি, ঘর মোছা পানি ড্রেন, নর্দমা ও খালের মাধ্যমে বের করার ব্যবস্থাকে পয়ঃনিষ্কাশন বলে। যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। মানুষ বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে সাধারণত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ। উন্নত গ্রামগুলোতেও এ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। সব গ্রামেই পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ডাকঘর

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে ডাকঘর আছে। ডাকঘরে পোস্টমাস্টার ও ডাকপিয়ন কাজ করেন। আমরা ডাকঘরে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লেখার জন্য পোস্টকার্ড ও ইনভেলপ কিনি। ডাকঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় চিঠি ফেলি। আত্মীয়স্বজনেরা দেশের বিভিন্ন

স্থান থেকে চিঠিপত্র লেখেন ও টাকা পাঠান। ডাকপিয়ন বাড়িতে গিয়ে চিঠিপত্র ও টাকা দিয়ে আসেন। ডাকপিয়ন এলে আমরা খুশি হই। কোন কোন ডাকঘরে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন করার ব্যবস্থা আছে।

ক্লাব ও পাঠাগার

বড় বড় শহরে ক্লাব আছে। থানা/উপজেলা পর্যায়েও ক্লাব রয়েছে। অনেক গ্রামেও ক্লাব গড়ে উঠেছে। ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। ক্লাবে আমরা বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করি। যেসব গ্রামে ক্লাব নেই সেখানে ক্লাব গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ক্লাবের মত শহরে ও গ্রামে পাঠাগার আছে। আমাদের যেসব গ্রামে পাঠাগার নেই সেসব গ্রামে পাঠাগার গড়ে তুলব। পাঠাগারে আমরা বিভিন্ন ধরনের বইপত্র ও পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা করব ও নিয়মিত পড়ব।

খেলার মাঠ ও পার্ক

সুস্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলা করা প্রয়োজন। এ জন্য দরকার খেলার মাঠ। খেলার মাঠে আমরা নানা রকম খেলাধুলা করব।

শহরে পার্ক গড়ে তোলা হয়। একঘেঁয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্য মানুষ পার্কে বেড়াতে যায়।

উপাসনালয়

ধর্ম পালনের জন্য উপাসনালয় গড়ে তোলা হয়। বড়দের সাথে আমরা মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্য যাই। এসব উপাসনালয়ে আমরা নিজ নিজ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি।

পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এসব সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের সকল মানুষের অধিকার আছে। আমরা কখনই এসব সম্পদের অপচয় করব না। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানি ব্যবহার করব। বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে অপয়োজনে বাতি ও পাখা চালাব না। টিফিন পিরিয়ডে ও বিদ্যালয় ছুটি হলে শ্রেণীকক্ষের বাতি ও পাখার প্রতিটি সুইচ বন্ধ

করব। রান্নাঘরে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখব না। গ্যাসের চুলা বন্ধ আছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখব। আমাদের সম্পদ সীমিত। জনসংখ্যা অনেক বেশি। সম্পদ দ্রুত কমে গেলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমরা পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহারে মিতব্যয়ী হব।

আমরা বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশেপাশের রাস্তাঘাটে ছেঁড়া কাগজ, বাদামের খোসা, চকলেট ও আইসক্রিমের মোড়ক ও কাঠি ফেলব না। পাঠাগারের বইয়ের যত্ন নেব। যত্নসহকারে পাঠাগারের বই পড়ব, কোন বই নষ্ট করব না। ক্লাবঘরের খবরের কাগজ, খেলার সামগ্রী ও আসবাবপত্র ব্যবহারের পর গুছিয়ে যথাস্থানে রাখব। পার্কে বাদাম, বুট, চানাচুর ফেলে নোংরা করব না। প্লাস্টিকের বোতল যেখানে সেখানে ফেলব না। পার্কের বেঞ্চ নোংরা করব না। এগুলো আমাদের সামাজিক সম্পদ। এ সব জিনিস আমরাই ব্যবহার করি। সুতরাং এসবের যত্ন নেয়া আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ক. রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো-----সরাসরি পরিচালনা করেন।
- খ. ছোট ছেলেমেয়েদের-----পার হতে কষ্ট হয়।
- গ. -----না থাকলে টেলিফোন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে।
- ঘ. যথাযথ-----ব্যবস্থার অভাবে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়।
- ঙ. পাঠাগারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের-----ও পত্রিকা পড়ব।

২। নিচের শূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে 'শু' এবং অশূন্য উক্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ।

- ক. বস্তু নয় এমন কিছুও সম্পদ হতে পারে।
- খ. সাঁকোর ওপর দিয়ে বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে।
- গ. রোগ নির্ণয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়।
- ঘ. বসতবাড়ি, জমিজমা, গরু, মহিষ, ছাগল হাঁস-মুরগি প্রভৃতি সামাজিক সম্পদ।
- ঙ. সুস্বাস্থ্যের জন্য পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. আমরা প্রতি দিন আমাদের আশেপাশের	অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান
খ. সেতুর ওপর দিয়ে	আলোকিত করে
গ. আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ	বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে
ঘ. বিদ্যুৎ আমাদের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট	অনেক কিছুই ব্যবহার করি
ঙ. টেলিফোন আধুনিক জীবনযাপনের	টিউবওয়েলের পানি পান করেন
	গুছিয়ে যথাস্থানে রাখব

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ কোন সম্পদ সরকার সরাসরি পরিচালনা করেন?

- ক. ব্যক্তিগত সম্পদ খ. সামাজিক সম্পদ
গ. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ঘ. যৌথ সম্পদ।

৪.২ কোনটি এক প্রকার শক্তি ?

- ক. টিউবওয়েল খ. বিদ্যুৎ
গ. টেলিফোন ঘ. টেলিভিশন।

৪.৩ ডাকঘরে কে কাজ করেন ?

- ক. হেডমাস্টার খ. পোস্টমাস্টার
গ. ডাক্তার ঘ. পুলিশ।

৪.৪ মানুষ কী জন্য পার্কে যায়?

- ক. লেখাপড়া করতে খ. বেড়াতে
গ. খেলাধুলা করতে ঘ. কেনাকাটা করতে।

৪.৫ কোনটি সামাজিক সম্পদ?

- ক. বসতবাড়ি খ. গ্যাস
গ. মোটরগাড়ি ঘ. বিদ্যালয়।

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক. রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে? কয়েকটি রাষ্ট্রীয় সম্পদের নাম লেখ।
খ. বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
গ. গ্যাসের গুরুত্ব লেখ।
ঘ. পয়ঃনিষ্কাশন কাকে বলে? পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে কী কী ক্ষতি হয়?
ঙ. উপাসনালয়ের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

অধ্যায় সতের

এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতি

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এর উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, লোহিত সাগর ও ইউরোপ মহাদেশ। এশিয়া মহাদেশে অনেক দেশ রয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশের নাম নিচের ছকে পড়ি।

১। বাংলাদেশ	৭। মালদ্বীপ
২। ভারত	৮। মালয়েশিয়া
৩। পাকিস্তান	৯। জাপান
৪। নেপাল	১০। সৌদি আরব
৫। ভুটান	১১। ইরাক
৬। শ্রীলঙ্কা	১২। মায়ানমার

আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে ভারত ও মায়ানমারের সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা আরও দুইটি দেশ- জাপান ও মালয়েশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব।

জাপান

এশিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে জাপান অবস্থিত। ছোট বড় কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত। পূর্ব দিকের দেশগুলোর মধ্যে জাপানে সর্বপ্রথম সূর্য উদয় হয়। এজন্য জাপানকে ‘সূর্যোদয়ের দেশ’ বা ‘নিপ্পন’ বলা হয়। এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। এ কারণে আগে জাপানের ঘরবাড়িগুলো বাঁশ, কাঠ, কাগজ প্রভৃতি হালকা বস্তুর সাহায্যে তৈরি হত। বর্তমানে জাপানে ভূমিকম্প প্রতিরোধ করে টিকে থাকার মত পাকা বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে।

ভাষা

জাপান একক ভাষার দেশ। এ দেশের প্রধান ভাষা জাপানীজ। অফিস আদালতে এই ভাষা ব্যবহার করা হয়।

ধর্ম

জাপানের অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়াও কিছু মানুষ শিন্তো ধর্মে বিশ্বাসী। এরা সূর্য উপাসক।

খাদ্য

জাপানের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। মাছের মধ্যে সামুদ্রিক মাছই জাপানিরা বেশি খায়। তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে রয়েছে নোরি (সমুদ্রজাত শৈবাল) টেমপুরা, শাশিমি, সুশী সাবা (নুডলস জাতীয় খাবার)। তারা বাটিতে খাবার নিয়ে কাঠি দিয়ে খায়। এটি তাদের একটি বৈশিষ্ট্য।



চিত্র ১৬.১ : জাপানিদের খাবার (কাঠি দিয়ে খায়)

পোশাক

জাপানিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'কিমোনো'। এটি একটি সুদৃশ্য রঙের পোশাক।

কিমোনোর আদলে তৈরি ‘ইয়ুকাতা’ও তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। এটি অপেক্ষাকৃত সাধারণ পোশাক। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে নারীপুরুষ সকলেই তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ‘কিমোনো’ ও ‘ইয়ুকাতা’ পরিধান করে। বর্তমানে জাপানিরা, টি সার্ট, জিনস ইত্যাদি পশ্চিমা পোশাক পরিধান করে।



চিত্র ১৬.২ : জাপানিদের পোশাক

সংগীত ও নৃত্য

জাপানিরা খুবই সংগীতপ্রিয়। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লোক সংগীতের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ‘অনদো’ ও ‘এনকা’- এ ধরনের লোক সংগীত। ‘অনদোর’ তালে তালে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দলনৃত্য পরিবেশন করে। জাপানের বিখ্যাত নৃত্য ‘বোনওদোরি’ এছাড়াও ‘কাবুকি’ নামক এক ধরনের মুখোশ নৃত্য এখানে পরিবেশিত হয়।

আধুনিকতার জোয়ারে ব্যান্ড সংগীতের প্রভাবে জাপানি সংগীত তার মূল প্রভাব থেকে সরে এসেছে।

খেলাধুলা

জাপানিরা খেলাধুলা ভালবাসে। এ দেশের ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো হল- সুমো, কুস্তি, জুডো, কারাতে, কেনডো, ঘুড়ি ওড়ানো ইত্যাদি। সুমো জাপানের জাতীয় খেলা। এটি জাপানে খুবই জনপ্রিয়। এছাড়াও মেয়েদের খেলা ওহাজিকি আইয়াতোরি এবং ছেলেদের খেলা মেন্কো বেইগোমা উল্লেখযোগ্য।



চিত্র ১৬.৩ : জাপানিদের খেলাধুলার ছবি

রীতিনীতি ও লোকাচার

জাপানিদের সামাজিক জীবনে কতগুলো রীতিনীতি ও লোকাচার রয়েছে। এ দেশের উৎসবগুলো অধিকাংশই ঋতুভিত্তিক। এ দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব ‘ওশৌগাটসু’ বা

নববর্ষ। নববর্ষের প্রথম তিন দিন এই উৎসব হয়। সে সময় অফিস আদালত সব ছুটি থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ বিভিন্ন মন্দির অথবা পবিত্র স্থানে জমা হয়। নতুন বছরটি যেন ভালভাবে কাটে সেজন্য তারা প্রার্থনা করে। এছাড়া তারা ইকোবানা বা ফুল সাজানো এবং চা উৎসব পালন করে। এগুলো সরলতা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক।

চেরিন্ত্য

বসন্তকালে যখন গাছে গাছে চেরিফুল ফোটে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। এ সময় তারা চেরিন্ত্য পরিবেশন করে।

শরত ফসল কাটার ঋতু। এ সময় গ্রামীণ এলাকায় নানা ধরনের পিঠা উৎসব হয়।

ট্যঙ্গু নো সেক্কু (শিশু দিবস)

প্রতি বছর মে মাসের ৫ তারিখে এ উৎসব পালন করা হয়। এ দিন যাদের বাড়িতে পুত্র সন্তান আছে তারা তাদের ছেলেদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বাড়ির ছাদে কার্প (রুই কাতলা জাতীয় মাছ) মাছের প্রতিকৃতি পতাকার মত ঝুলিয়ে রাখে।

জাপানিদের কেউ মারা গেলে মৃতদেহ আগুনে পোড়ায় এবং ছাইগুলো গর্ত করে মাটিতে পুতে রাখে।

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এটি অত্যন্ত সুন্দর একটি দেশ। এ দেশের মানুষ খুবই অতিথিপরায়ণ।

ভাষা

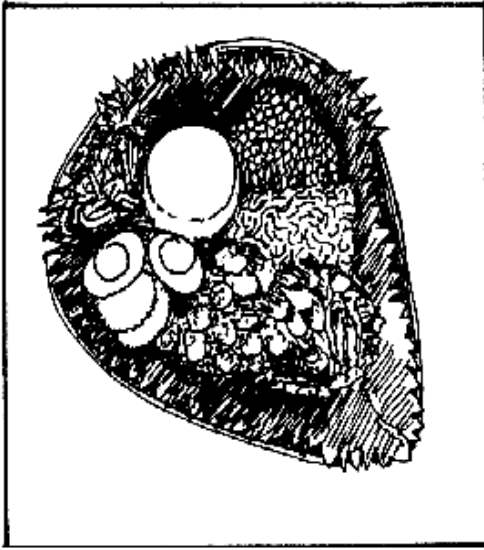
মালয়েশিয়ার অধিকাংশ লোক মালয় ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও তেলেগু, মালয়ালাম, পাঞ্জাবি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার প্রচলন রয়েছে।

ধর্ম

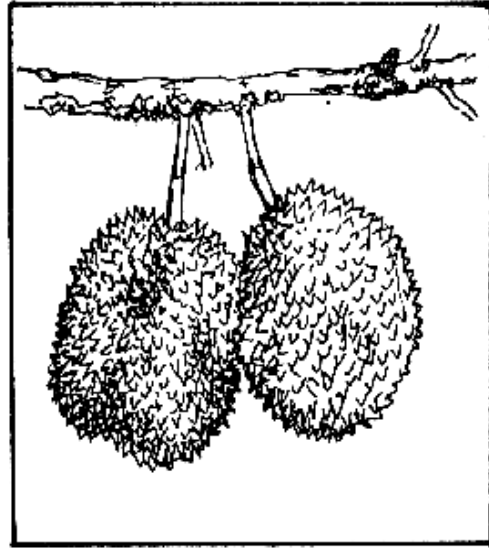
মালয়েশিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। তবে খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকও এখানে বাস করে।

খাদ্য

মালয়েশিয়ার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। তারা খাবারে মশলা বেশি ব্যবহার করে। সকালের নাস্তায় তাদের প্রিয় খাবার হল ‘নাসিলেমার্ক’। এটি একটি মশলাযুক্ত সুগন্ধি ভাত জাতীয় খাবার। এর সাথে নারকেলের দুধ এবং মুরগি অথবা গরুর গোশতের তরকারি থাকে। এ খাবার কলাপাতায় পরিবেশন করা হয়। এ ছাড়াও তারা চাইনিজ খাবার, ইন্দোনেশিয়ান খাবার, ভারত ও পাকিস্তানের খাবার খায়। ফলের মধ্যে আনারস, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আম এবং ডুরিয়ান নামক ফল খায়। ডুরিয়ানকে তারা ‘ফলের রাজা’ বলে। এটি আমাদের দেশের কাঁঠালের মত। এই ফল গন্ধ এবং কাঁটায়ুক্ত।



চিত্র ১৬.৪ : মালয়েশিয়ান খাদ্য নাসিলেমার্ক



চিত্র ১৬.৫ : মালয়েশিয়ান ফল ডুরিয়ান

পোশাক

সাধারণত বিভিন্ন রঙের সিল্কের পোশাক মালয়েশিয়ানদের খুবই প্রিয়। স্কার্ফ ও কাস্তান তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। বাটিকের কাজ করা কাপড় তারা খুব পছন্দ করে। তারা সোনা রূপার গহনা পড়তে ভালবাসে।



চিত্র ১৬.৬ : মালয়েশিয়ান মানুষের পোশাক

সংগীত ও নৃত্য

মালয়েশিয়ার সংগীত এবং নৃত্য একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এখানে রয়েছে ‘ছায়া পুতুল’ থিয়েটার। এটি জাভা থেকে এসেছে। এছাড়া ‘চাইনিজ অপেরা’ উল্লেখযোগ্য। নারকেলের শক্ত খোশা দিয়ে এ দেশের বেশির ভাগ বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হয়। তারিয়ান লিলিন একটি মোমবাতির নৃত্য। এটি কুমারী মেয়েদের নৃত্য। ‘সামাজাও’ তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচের নাম। ফসল কাটার উৎসবে এ নৃত্যটি পরিবেশিত হয়।

খেলাধুলা

মালয়েশিয়ার মানুষ খেলাধুলা প্রিয়। ঘুড়ি ওড়ানো মালয়েশিয়ার একটি প্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী খেলা। এই খেলাকে মালয়েশিয়ায় ‘ওয়াও’ বলে। ‘সিলাত’ও তাদের প্রিয় খেলা। এটি জাপানি কারাতের মত একটি খেলা। এছাড়া সমুদ্রে মাছ ধরে তারা আনন্দ পায়।

রীতিনীতি ও লোকাচার

এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের লোক বিভিন্ন উৎসব পালন করে। মুসলমানরা ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা পালন করে। ঈদকে তারা ‘হরি রাইয়া’ বলে। হিন্দুরা আলোর উৎসব

‘দীপাবলী’ পালন করে। খ্রিস্টানরা ক্রিস্টমাস উৎসব পালন করে। মজোলিয়ানরা ‘মুন কেক’ উৎসব, চীনারা ‘চৈনিক নববর্ষ’ পালন করে। এছাড়াও মালয়েশিয়ানরা ‘কাডাজান’ উৎসব নামে ফসল কাটার উৎসব পালন করে। এ দেশের হস্তশিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প এবং তাম্রশিল্প উল্লেখযোগ্য।

আমরা জাপান ও মালয়েশিয়ার সংস্কৃতির অনেক দিকের সাথে পরিচিত হলাম। নিচের ছকে আমরা এ দুটি দেশের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় তুলে লিখি।

সংস্কৃতি	জাপান	মালয়েশিয়া
১. ভাষা		
২. ধর্ম		
৩. খাদ্য		
৪. পোশাক		
৫. খেলাধুলা		

এভাবে আমরা বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ।
- পূর্ব দিকের দেশগুলোর মধ্যে-----সর্বপ্রথম সূর্য উদয় হয়।
- মাছের মধ্যে-----মাছই জাপানিরা বেশি খায়।
- কাজ করা কাপড় মালয়েশিয়ানরা খুব পছন্দ করে।
- মালয়েশিয়ার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য-----ও মাছ।

২। নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ।

- ক. এশিয়ার উত্তরে ভারত মহাসাগর।
 খ. জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।
 গ. জাপানের প্রধান খাদ্য মিসো।
 ঘ. মালয়েশিয়া একটি অত্যন্ত সুন্দর দেশ।
 ঙ. মালয়েশিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর।

ক. জাপানিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক	খুবই অতিথিপরায়ণ
খ. চেরিন্ত্য পরিবেশন করে	ফলের রাজা
গ. মালয়েশিয়ার মানুষ	বসন্তকালে
ঘ. ডুরিয়ানকে বলা হয়	ইকোবানা
ঙ. জাপানিদের ফুল সাজানো উৎসব	কিমোনো
	আনারস

৪। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

৪.১ ইরাক কোন মহাদেশে অবস্থিত?

- ক. ইউরোপ
 খ. এশিয়া
 গ. আফ্রিকা
 ঘ. অস্ট্রেলিয়া

৪.২ এশিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে কোন্ দেশ অবস্থিত?

- ক. জাপান
 খ. ইরাক
 গ. নেপাল
 ঘ. সৌদি আরব।

৪.৩ জাপানের অধিকাংশ মানুষ কোন ধর্মাবলম্বী?

- ক. মুসলমান
 খ. খ্রিস্টান
 গ. বৌদ্ধ
 ঘ. হিন্দু।

৪.৪ মালয়েশিয়ার অধিকাংশ মানুষ কোন্ ভাষায় কথা বলে?

ক. মালয়

খ. পাঞ্জাবি

গ. হিন্দি

ঘ. তেলুগু।

৪.৫ মালয়েশিয়ানরা খাবারে কী বেশি ব্যবহার করে?

ক. মিষ্টি

খ. মসলা

গ. তেল

ঘ. ঝাল।

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

খ. জাপানকে ‘সূর্যোদয়ের দেশ’ বলা হয় কেন?

গ. জাপানিদের পোশাক কীরূপ।

ঘ. জাপানিদের খেলাধুলার নাম লেখ।

ঙ. মালয়েশিয়ানদের খাদ্যের বর্ণনা দাও।

অধ্যায় আঠার

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

পৃথিবীতে আমাদের মত অনেক দেশ আছে, সব দেশেই যেমন শিশু আছে তেমন বড়রাও রয়েছে। প্রত্যেকের ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা এক। এ সকল চাহিদা ভোগ করার সবার সমান অধিকার রয়েছে। পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতায় এ সকল অধিকার ভোগ করার জন্য সম্মিলিতভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং এর সুফল পরস্পরের সাথে মিলেমিশে ভাগ করে নিতে হবে। বিশ্বের মানুষ সংঘবদ্ধভাবে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে একে অন্যের সাথে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলাই হল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখলে সবার মাঝে মানবিক গুণাবলি বিকশিত হবে। মানুষে মানুষে সমঝোতা হবে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য সহযোগিতা করবে। সবার মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। বিশ্বে শান্তি আসবে।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা কী লিখি।

১।
২।
৩।
৪।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আমরা সব সময় সচেষ্ট হব। যদি কোন দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি দুর্যোগ হয় তাহলে আমরা আমাদের দেশের সবার কাছ থেকে সাহায্য নেব। এই সাহায্য যথাস্থানে প্রেরণের জন্য সরকারের কাছে পৌঁছে দেব। কোন দেশে দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা সমব্যথী হব এবং তাদেরকে সমবেদনা জানাব। বিশ্বের

সকলের জন্য ভাল কিছু করা ও সকল সুবিধা এক সাথে ভোগ করার মানসিকতা গড়ে তুলব। বিশ্বে কাউকে এমন অবস্থায় যেতে দেওয়া যাবে না যাতে তার মানবিক গুণাবলি বিকাশ ব্যাহত হয়। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মাঝে সমঝোতা ও সহযোগিতা বজায় রাখাকে বিশ্ব ভাতৃত্ব বলে।



চিত্র ১৭.১ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ

আমাদের দেশের আশেপাশে যে দেশগুলো রয়েছে তারাই আমাদের প্রতিবেশী দেশ। সাধারণত প্রতিবেশী দেশের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মিল থাকে। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের দেশে যে পণ্যটি উৎপাদিত হচ্ছে না আমরা প্রতিবেশী দেশ থেকে তা আনতে পারি। প্রতিবেশী দেশের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। দেশের স্থিতিশীলতা কমে যায়। শান্তি বিঘ্নিত হয়। এ জন্য বিশ্বে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন এবং পরস্পরের সার্বিক অগ্রগতিতে সাহায্য করাকে আঞ্চলিক সহযোগিতা বলে।

নিচের ছক খাতায় তুলে আঞ্চলিক সহযোগিতা কাকে বলে লিখি।

আমরা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাস করি। এ অঞ্চলের নাম দক্ষিণ এশিয়া। বাংলাদেশ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার এই সাতটি দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। সংক্ষেপে সার্ক (SAARC)। ইংরেজি পরিভাষায় বলা হয় সাউথ এশিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওন্যাল কো-অপারেশন (South Asian Association For Regional Co-operation)।

এই সংস্থা গঠনের রূপকার ছিলেন বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।



চিত্র : ১৭.২ সার্কভুক্ত দেশের মানচিত্র

নিচের ছকে সার্ক দেশগুলোর রাজধানীর নাম পড়ি

দেশ	রাজধানী
১. বাংলাদেশ	ঢাকা
২. ভারত	দিল্লী
৩. পাকিস্তান	ইসলামাবাদ
৪. নেপাল	কাঠমান্ডু
৫. ভুটান	থিম্পু
৬. শ্রীলঙ্কা	কলম্বো
৭. মালদ্বীপ	মালে

দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হল সার্ক। সার্কের সচিবালয় কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। ১৯৮৫ সালের ৮ ই ডিসেম্বর সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এটি গঠিত হয়।

সার্কের মূলনীতি

সার্কের মূলনীতি হল সংস্থার যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে। আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে। কোনো দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে অন্য কোন দেশ হস্তক্ষেপ করবে না। পরস্পরের কল্যাণের জন্য সহযোগিতা করতে হবে।

নিচের ছকটি খাতায় তুলে সার্কের মূলনীতিগুলো কী কী লিখি

১।
২।
৩।
৪।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনজীবনের মান উন্নয়ন করাই সার্কের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এছাড়া আরও যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে নিচের ছকে পড়ি।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা দ্রুত করা
জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা
আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করা
পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা
সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা
একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রযুক্তি ও শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি যত বাড়বে ততই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

- প্রত্যেকের — এক।
- বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখলে সবার মাঝে — বিকশিত হবে।
- আমাদের দেশের আশেপাশে যে দেশগুলো রয়েছে তারাই আমাদের — দেশ।
- কোন দেশে দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা — হব।
- সার্কের মূলনীতি হল সংস্থার যে কোন সিদ্ধান্ত — হতে হবে।

২। নিচের উক্তিগুলির যেটি শুদ্ধ তার ডান পাশে 'শু' এবং যেটি অশুদ্ধ তার ডান পাশে 'অ' লেখ।

- প্রত্যেকের ভাষা সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস এক।
- প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করলে বিশ্বের শান্তি বিদ্যিত হবে।
- বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব মানে সব দেশের মানুষের মাঝে সমঝোতা ও সহযোগিতা থাকা।
- নেপালের রাজধানীর নাম থিম্পু।
- সার্কের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করা।

ক. সবার সাথে সহযোগিতা ও সমঝোতা করে চললে	সচেষ্ট হব
খ. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আমরা সব সময়	আমাদের প্রতিবেশী দেশ
গ. আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলো রয়েছে তারাই	সার্ক নামে পরিচিত
ঘ. দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সংক্ষেপে	সার্কের মূলনীতি
ঙ. আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা	ধারণা সৃষ্টি করা
	সবার প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে

- ক. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কাকে বলে?
- খ. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কীভাবে গড়ে ওঠে?
- গ. সার্কের পুরো নাম কী? রাজধানীসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর নাম লেখ।
- ঘ. সার্কের মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর।
- ঙ. সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখ।

২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪-স

গাছ মানুষের পরম বন্ধু।



দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)-এর
আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে :